৬.১২ নররাক্ষস ও দস্যু বনহুর – Bangla Library

৬.১২ নররাক্ষস ও দস্যু বনহুর – Bangla Library

নররাক্ষস ও দস্যু বনহুর – ৯২

বনহুর চমকে ফিরে তাকাতেই মনিরার মুখমন্ডলে দৃষ্টি পড়লো তার। গম্ভীর কঠিন সে মুখে একটা ক্রুদ্ধ ভাব ফুটে উঠেছে। বনহুর বুঝতে পারলো এটা ঝড়ের পূর্বলক্ষণ।

সমস্ত কক্ষটা থমথম করছে।

নূরীও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে।

এগিয়ে আসে মনিরা–চুপ করে আছো কেন, বলো কি বলছিলে?

বনহুর বললো–মনিরা, তোমাকে একটা কথা আমি বলতে চেয়েছি বহুদিন কিন্তু তুমি শুনতে চাওনি। আজ সেই সুযোগ এসেছে, শোন……

আমি তোমার কোনো কথা শুনতে চাই না, আমাকে তুমি ফিরিয়ে নিয়ে চল।

মনিরা!

না না, কোনো কথা শুনতে চাই না আমি, তুমি আমাকে নিয়ে চলো। নিয়ে চলো আমাকে কথাগুলো বলে ছুটে বেরিয়ে যায় মনিরা।

বনহুর তাকায় নূরীর মুখের দিকে।

নূরী হতভম্ব হয়ে পড়েছে।

বনহুর নির্বাক।

নূরীর মুখমন্ডল ধীরে ধীরে প্রসন্ন হয়ে আসে, বলে সেহর, আমাকে তুমি ক্ষমা করো। যাও, মনিরা আপাকে তুমি শান্ত করোগে। যাও হুর, যাও।

বনহুর যন্ত্রচালিত পুতুলের মত বেরিয়ে যায় কক্ষ থেকে।

নূরীর মুখখানা ম্লান, বিষণ্ন হয়ে উঠলো।

বনহুর বেরিয়ে যেতেই নাসরিন এসে দাঁড়ালো নূরীর পাশে।

নূরী নাসরিনের বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো–একি হলো নাসরিন, একি হলো? আমার হুরের জীবন এমন দুর্বিসহ হয়ে উঠবে ভাবতে পারিনি।

নাসরিন বললো–মনিরা আপামনিকে আস্তানায় আনা সর্দারের ঠিক হয় নি, কারণ আস্তানায় তুমি আছো এটা সে ভুলে গেলে কি করে?

ভোলেনি নাসরিন, ভোলনি। মনিরা আপাকে এখানে না এনে কোনো উপায় ছিলো না, কারণ পুলিশ হুরের পিছু নিয়ে ছিলো। তাছাড়াও মনিরা আপা সংজ্ঞাহীন ছিলো, এমন অবস্থায় তাকে কি করে চৌধুরীবাড়িতে নিয়ে যাবে সে?

তা তো বুঝলাম কিন্তু এখন এখন উপায়?

আমার কিন্তু ভাল লাগে না নিজকে গোপন রাখ। নাসরিন, আমি চাই মনিরা আপা সব জানুক।

নাসরিন বললো–নুরী, তুমি যা চাও তা সর্দারের জন্য শুভ নয়, কারণ কোনো নারীই চায় না তার স্বামী অপর কোনো নারীকে…

না, তা হয় না, হুর আমার…

মনিরা আপাও ঠিক তোমার মতই জোর গলায় বলবে সর্দার তার, তখন তুমি কি বলবে বলো?

না না, তা হয় না, হুর আমার। নাসরিন, তুই চলে যা, তুই চলে যা এখান থেকে। আমাকে একা থাকতে দে।

বেশ; আমি যাচ্ছি কিন্তু তুমি বেশি ভেবো না। ভাবলে তোমার মাথা গুলিয়ে যাবে নূরী।

আমি জানি সব জিনিসে ভাগ চলে, শুধু ভাগ দিতে পারে না কোনো নারী তার স্বামীকে।

নূরী আকুলভাবে কেঁদে উঠে।

ঠিক তখন মনিরা বনহুরের বিশ্রামকক্ষে বালিশে মুখ গুঁজে উচ্ছ্বসিতভাবে কাঁদছিলো। দুলে দুলে উঠছে তার দেহটা, চোখের পানিতে ভিজে উঠেছে গোটা বালিশ।

বনহুর কক্ষে প্রবেশ করে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। তারপর সহসা অট্টাহাসিতে ফেটে পড়লো সে। হাসি যেন থামতে চায় না। তারপর হাসি থামিয়ে এসে দাঁড়ালো মনিরার পাশে। কাঁধে হাত রাখলে মনিরার, শান্তকণ্ঠে ডাকলো–মনিরা! শোন মনিরা–আমার জীবন স্বাভাবিক নয়, একথা জেনেও তোমরা আমাকে ভালবেসেছো–তোমাদের প্রেম–ভালবাসা দিতে এতটুকু কার্পণ্য করোনি।

মনিরা মুখ তুলে কঠিন কণ্ঠে বললো–এই কি তার প্রতিদান? আমার প্রেম–ভালবাসাকে তুমি তুচ্ছ করে দিয়ে ঐ মেয়েটাকে তুমি…

মনিরা, শোন।

না, আমি তোমার কোনো কথাই শুনবো না। আমি সব বুঝতে পেরেছি। ঐ মেয়েটি ফুল নাম ধারণ করে আমারই বাড়িতে আমার দাসীরূপে কাজ করেছে। আমার তখনই সন্দেহ হয়েছিলো ওর সঙ্গে তোমার কোনো যোগাযোগ আছে। আমি তোমাকে কিছুতেই ক্ষমা করবো না। মনিরা বনহুরের সম্মুখের জামার অংশ টেনে ধরে ঝাঁকুনি দিলো খুব করে, তারপর দুহাতে কিল দিতে লাগলো বনহুরের বুকে।

বনহুর আবার অট্টহাসি হেসে উঠলো।

যতক্ষণ মনিরা বনহুরের বুকে আঘাত করে চললো ততক্ষণ বনহুর হাসতে লাগলো।

এক সময় মনিরার হাত দু'খানা ব্যথায় টনটন করে উঠলো, সে দু'হাতে এবার মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

বনহুর বললো–মনিরা, যা এতদিন শুনতে চাওনি আজ তা তোমাকে শুনতে হবে।

না, আমি এমন কোনো কথা শুনতে চাই না যা আমার মনকে চুর্ণ–বিচুর্ণ করে দেবো। আমি শুনতে চাই না, শুনতে চাই না কোনো কথা, যাও চলে যাও তুমি এখান থেকে।

বেশ, আমি চলে যাচ্ছি, তুমি আস্তানা পরিচালনা করো।

যাও চলে যাও, তোমার মুখ আমি দেখতে চাই না।

আমার অপরাধ?

এতদিন আমি তোমাকে চরিত্রবান দেবপুরুষ বলে পূজা করেছি আর আজ তোমাকে আমি সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করছি। ছিঃ ছিঃ ছিঃ তুমি না আমাকে বলতে কোনো নারীকে তুমি স্পর্শ করোনি, কোনো নারী তোমার জীবনকে কলুষিত করেনি

হাঁ, সে কথা সত্য! দৃঢ় গম্ভীর কণ্ঠস্বর বনহুরের।

মনিরা তাকালো স্বামীর মুখের দিকে কতকটা অবাক চোখে। সে দেখলো ঐ মুখে নেই কোনো কলুষতার ছাপ, নেই কোনো অপরাধমূলক প্রতিচ্ছবি–নিষ্পাপ শান্ত গম্ভীর একটা মুখ।

মনিরা পারলো না নিজকে সংযত রাখতে, সে ছুটে এসে বনহুরের বুকে লুটিয়ে পড়লো।

বনহুর ওকে গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে ডাকলোমনিরা। চলো, তুমি না আমার স্নানাগার দেখতে যাবে বলেছিলে?

মনিরা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

বনহুর বললো–চললা তুমি যা দেখতে চাও সব দেখাবো। যা শুনতে চাও সব বলবো। মনিরা, তুমি যে শাস্তি আমাকে দিতে চাও আমি তা মাথা পেতে গ্রহণ করবো।

স্বামীর বুকে মুখ গুঁজে রইলো মনিরা, অনন্তকাল ধরে সে এমনি করে স্বামীকে একান্ত নিজের করে পেতে চায়। সে চায় না তার স্বামী তার কাছ থেকে মুহূর্তের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যাক।

*

এক নির্জন স্থানে পাশাপাশি বসেছিলো বনহুর আর রহমান। জায়গাটা কান্দাই পর্বতের এক নিভৃত স্থান। পায়ের কাছে বয়ে চলেছে উচ্ছল ঝরণাধারা কলকল শব্দ। পাথরে আছাড় খেয়ে খেয়ে স্বচ্ছ জলধারা নেমে চলেছে নিচের দিকে।

ভারী সুন্দর–অপূর্ব দৃশ্য!

বনহুরের কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি নেই। তার দৃষ্টি সম্মুখস্থ বিস্তৃত পর্বতখানার দিকে।

রহমান নিশ্চুপ।

মাঝে মাঝে সে সর্দারের দিকে তাকিয়ে দেখে নিচ্ছে সর্দারের অলক্ষ্যে। রহমান যদিও সর্দারের মুখ থেকে এমন কোনো উক্তি এখনও শুনতে পায় নি, তবু সে

সবকিছু জানে এবং বোঝে। নাসরিনের মুখে সে যতটুকু জানতে পেরেছে তা থেকেই সবকিছু আঁচ করে নিয়েছে সে। রহমান বনহুরের শুধু সহকারীই নয়, বন্ধুও বটে। রহমান বনহুরের হিতাকাঙ্ক্ষী পরম আপনজন।

বনহুরের জীবনে যদি অশান্তি নেমে আসে তাহলে শুধু রহমানের নয়, গোটা আস্তানায় নেমে আসবে দারুণ অভিশাপ এবং সে কারণেই রহমান চিন্তিত। রহমান চায় সর্দারের মন সদা প্রসন্ন থাক, তাছাড়াও যে অশান্তির ঢেউ বয়ে চলেছে এখন তার জন্য দায়ী রহমান নিজে। তাই তার মনটাও কম বিষণ্ন নয়।

সর্দারকে কিছু বলবে বলেই রহমান সর্দারের পিছু নিয়েছিলো এবং এতদূর এসেছে।

অদূরে নিচু জায়গায় তাজ আর দুলকী দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে মাথা অবনত করে দাঁতের ডগা দিয়ে সবুজ ঘাসের মাথাগুলো কামড়ে ছিঁড়ে নিচ্ছিলো।

আশেপাশে কোনো জীবজন্তুর আনাগোনা নেই, তাই যেন ওরা নিশ্চিন্ত।

কতকগুলো নাম না জানা পাখি মাথার উপর ভেসে বেড়াচ্ছিলো সচ্ছ আকাশে হালকা মেঘের মত।

বনহুর নিস্তব্ধতা ভেঙে বলে উঠলো–রহমান, তুমি হয়তো সব শুনেছো?

হা সর্দার, সব জানি আমি।

কি করবো আমাকে বলে দাও রহমান, আমাকে বলে দাও?

সর্দার, এজন্য আমিই অপরাধী। আমাকে আপনি শাস্তি দিন সর্দার, শাস্তি দিন।

না, তুমি অপরাধী নও রহমান, সব আমার ভাগ্য। ভাগ্যে যা থাকে তা কেউ রোধ করতে পারে না, পারে না রহমান। নূরীর প্রেম–ভালবাসাকে উপেক্ষা করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিলো। আমি ভীষণ এক সংশয়ের মধ্যে কাল কাটাচ্ছিলাম। তুমি তার মীমাংসা করেছিলে মাত্র।

সর্দার!

হাঁ রহমান, তাই। হয়তো তুমি সেদিন না বললেও, না জেদাজেদি করলেও আমি নূরীকে গ্রহণ না করে পারতাম না। দীর্ঘ সময় আমি গভীরভাবে চিন্তা করেছি তবু কোনো সমাধান খুঁজে পাইনি। তুমিই সমাধান এনে দিয়েছিলে আমার জীবনে।

সর্দার, আমি শপথ করেছিলাম আপনার প্রতি নূরীর প্রেম ভালবাসা বিফলে যেতে দেবো না, তাই তাই আমি আপনাকে বাধ্য করেছিলাম নূরীকে বিয়ে করতে.....সর্দার, পুনরায় শপথ করছি, আপনার জীবনে দুর্বিসহের চরম দাহনে দগ্ধ হতে দেবো না। আমি বৌরাণীকে সব খুলে বলবো।

হাঁ, তাই বলো, তাই বলো রহমান। মনিরা কিছুতেই আমার মুখে কোনো কথা শুনতে চায় না। জানি ও কেমন করে বুঝতে পারে আমি তাকে আমার জীবনের চরম কথা বলবো।

সর্দার!

বল রহমান?

আমি বৌরাণীকে সব কথা বলবো। সব কথা আমি তাকে বুঝিয়ে বলবো সর্দার।

বেশ, তাই বল।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো।

রহমানও উঠে দাঁড়ালো সর্দারের সঙ্গে সঙ্গে

মনিরকে উঠে দাঁড়তে দেখে তাজ সম্মুখ পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করে চিহি চিহি শব্দ করে উঠলো।

বনহুর এবার নেমে এলো নিচে।

রহমান সর্দারকে অনুসরণ করলো।

বনহুর অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসবার পূর্বে রহমানকে লক্ষ্য করে বললো–রহমান, তুমি আস্তানায় যাও, একটু কাজে যাবো।

আচ্ছা সর্দার।

বনহুর তাজের পিঠে উঠে বসতেই কুর্ণিশ জানালো রহমান।

তাজ বনহুরসহ দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো।

তারপর রহমান ফিরে এলো আস্তানায়।

সোজা সে মনিরার কক্ষে প্রবেশ করলো।

বনহুরের বিশ্রামকক্ষই হলো মনিরার কক্ষ, কারণ এ কক্ষেই মনিরা আছে বা থাকে।

মনিরা বিছানায় শুয়েছিলো–চোখ দুটো তার অশ্রু ছলছল শ্রাবণের আকাশের মত মুখখানা তার থমথমে। না জানি কোন মুহূর্তে বারিধারা ঝরে পড়বে গন্ড বেয়ে।

রহমান কক্ষে প্রবেশ করে ডাকলো–বৌরাণী!

মনিরা চোখ তুলে তাকালো কিন্তু কোনো জবাব দিলো না।

রহমান দরজার পাশ থেকে সরে এলো মেঝের মাঝামাঝি, বললো–বৌরাণী, একটা কথা বলবো, যদি অনমুতি দেন।

মনিরা বলে উঠলো–কথা…কথা…কি তোমাদের একটা কথা যা বলার জন্য তোমাদের এত আগ্রহ

বৌরাণী, আপনি মিছামিছি সর্দারের উপর রাগ করেছেন। সর্দার কোনো দোষ করেননি বা করতে পারেন না।

এসব বলার জন্যই কি তুমি এখানে এসেছো?

আমাকে বলতেই হবে বৌরাণী……

আমি শুনবো না তোমাদের কোনো কথা। যদি মঙ্গল চাও তবে আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসো। নইলে আমি তোমাদের আস্তানার সন্ধান পুলিশের কাছে

জানিয়ে দেবো।

বৌরাণী!

না, তুমি যাও, যাও এখান থেকে।

বৌরাণী, একটু স্থির হোন, আমি যা বলতে এসেছি বলতে দিন।

বলেছি তো আমি তোমাদের কোনো কথাই শুনতে চাই না। আর এক মুহূর্ত আমি নিজেও এখানে থাকতে চাই না। যাও, তুমি আমাকে শহরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করো।

আপনি এত নিষ্ঠুর হতে পারলেন বৌরাণী?

না, আমি নিষ্ঠুর নই, নিষ্ঠুর তোমরা–তুমি, তোমার সর্দার……একটু থেমে বললো মনিরা–একটা অসহায় রমণীর উপর তোমাদের সর্দার এত নিষ্ঠুর হতে পারলো? আমার প্রেম–ভালবাসা তার কাছে কিছু। নয়? না না, আমি এখানে আর থাকতে চাই না। রহমান, আমাকে নিয়ে চলো তুমি……

বৌরাণী!

রহমান, জানি তোমরা আমাকে কি বলতে চাও। কিন্তু আমি তা শুনতে চাই না, কারণ আমি সে কথা সহ্য করতে পারবো না। সহ্য করতে পারবো না রহমান।

সর্দারকে আপনি ভুল বুঝবে না। সর্দার ফেরেস্তার মতই পবিত্র, নিষ্পাপ

রহমান!

হাঁ বৌরাণী।

তবে যে আমি নিজের চোখে দেখলাম…..বলো রহমান, ঐ মেয়েটি তাহলে কে?

রহমান মাথা নিচু করে রইলো, কোনো জবাব সে দিতে পারলো না।

মনিরা বললো–কি, চুপ করে আছো কেন, জবাব দাও? কে সে? তোমাদের সর্দারের সঙ্গে তার কি

এমন সময় ঝড়ের বেগে প্রবেশ করে নূরী–বৌরাণী, আমি সর্দারের কেউ নই, কিছু নই……বিশ্বাস করুন আমি তার কেউ নই।

মনিরা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকায় নূরীর দিকে।

নূরী বলে চলেছে–ছোটবেলা থেকেই আমি আর সর্দার একসঙ্গে মানুষ হয়েছি। একসঙ্গে খেলা করেছি, একসঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছি, একসঙ্গে শিকার করেছি—ওর সুখে আমি সুখী হয়েছি, ওর ব্যথায় ব্যথিত হয়েছি, তাই ওর সঙ্গে আমার যোগাযোগ। এছাড়া সে আমার কেউ নয়। বৌরাণী, সর্দারকে ভুল বুঝবেন না। আপনি তার স্বামী তার প্রিয়জন–আপনি যদি তার উপর বিশ্বাস হারান তাহলে সর্দার পাগল হয়ে যাবে। নূরী মনিরার পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাতে ওর পা দু'খানা চেপে ধরে বলে বলুন, বলুন বৌরাণী, আপনার স্বামীকে আপনি ক্ষমা করে দেবেন? বলুন?

রহমান মনিরা আর নূরীর অলক্ষ্যে বেরিয়ে যায় সেই কক্ষ থেকে।

মনিরা কোনো কথা বলে না, সে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

নূরী নাছোড়বান্দা, সে মনিরার পা দু'খানা কিছুতেই ছাড়ছে না, বারবার বলে বলুন বৌরাণী, আপনার স্বামীকে আপনি ক্ষমা করে দেবেন? আমি চলে যাবো দূরে, অনেক দূরে–সে আর আমার সন্ধান পাবে না।

মনিরা এবার তাকায় নূরীর দিকে। নুরীর করুণ মিনতিভরা চেহারা দেখে তার মন করুণা হয়, সে দু'হাত বাড়িয়ে নূরীকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলো।

নূরীর গন্ত বেয়ে ঝর ঝর করে ঝরে পড়ছে অশ্রুধারা। তার সুন্দর গোলাপী গন্ডখানা লাল হয়ে উঠেছে। নত চোখ দুটো তুলে ধরলো নূরী মনিরার মুখের দিকে।

মনিরার খুব মায়া হলো, বললো–আচ্ছা। আমি ওকে ক্ষমা করলাম।

সত্যি?

হাঁ।

চোখে অশ্রু, মুখে হাসি ফুটে উঠলো নূরীর, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো সে–আমি আপনার পা ছুঁয়ে শপথ করছি কেউ জানবে না কেউ বুঝবে না আমি চলে যাবো দূরে, অনেক দূরে–আপনার স্বামী আপনারই থাকবে, আর কোনোদিন সে আমাকে খুঁজে পাবে না…

নূরী মনিরার পা স্পর্শ করে উঠে দাঁড়ালো, তারপর সে বেরিয়ে যাবার জন্য দরজার দিকে পা বাড়াতেই পিছন থেকে ডাকলো মনিরা–শোন!

নূরী থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

মনিরা নূরীর পাশে এসে কাঁধে হাত রাখলো, স্নেহভরা গলায় বললো কোথায় যাবে তুমি আমি তোমাকে যেতে দেবো না।

বৌরাণী!

হাঁ। বুঝতে পেরেছি আমি যেমন ওকে ভালবাসি তেমনি তুমিও ওকে ভালবাসো। আমি যেমন ওর অমঙ্গল কামনা করতে পারি না, তেমনি তুমিও পারো না। বরং আমার চেয়ে তোমার প্রেম–ভালবাসা আরও গভীর, কারণ তুমি ওর ছোটবেলার সাথী…

বৌরাণী!

বৌরাণী নয়, মনিরা আপা বলেই ডাকবে।

কিন্তু….

আমি সব বুঝতে পেরেছি। ওর কোনো দোষ নেই, কারণ ও বহুদিন আমাকে কিছু বলতে চেয়েছে কিন্তু আমি ওকে বলার সুযোগ দেইনি। তুমি থাকবে ওর আস্তানায় আর আমি থাকবো শহরে…ও আমাদের দুজনার।

নুরী জড়িয়ে ধরে মনিরাকে, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে–মনিরা আপা!

মনিরাও আলিঙ্গন করে নূরীকে গভীর আবেগে।

উভয়ের গন্ড বেয়েই গড়িয়ে পড়ে অশ্রু।

এ আনন্দ অশ্রু না ব্যথার অশ্রু কে জানে।

এমন সময় জাভেদ প্রবেশ করে সেখানে, নূরী আর মনিরাকে এভাবে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, ভেবে পায় না এমনভাবে তারা উভয়ে উভয়কে কেন আলিঙ্গন করেছে। দু'জনার চোখেই অশ্রু ঝরছে। ব্যাপার কি বুঝতে পারে না জাভেদ। তবু ডাকে সে–আম্মু!

মনিরা নূরীকে মুক্ত করে দেয়।

নূরী ফিরে তাকায় জাভেদের দিকে।

জাভেদ মাকে লক্ষ্য করে বলে উঠলো–আম্মু, তোমার বোনকে বলে দিও আমি আব্বর আত্নীয় নই, আমি জাভেদ।

মনিরা বললো–এসো বাবা, আমার বুকে এসো, তুমি যে আমার নূর।

জাভেদ মায়ের মুখের দিকে তাকালো।

নূরী বললো–যাও জাভেদ, আমার বোন তোমার আম্মু হন। যাও, তার কোলে যাও।

জাভেদ এগিয়ে গেলো মনিরার দিকে।

মনিরা ওকে টেনে নিলো কোলের কাছে, আদর করলো প্রাণভরে। সব রাগ অভিমান মনিরার মন থেকে ধীরে ধীরে মুছে গেলো, একটা প্রসন্ন ভাব ফুটে উঠলো তার মুখে।

নূরীর মুখেও হাসি ফুটে উঠেছে, অনাবিল আনন্দে ভরে উঠেছে তার মন।

আড়ালে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করছিলো রহমান। সে তখন বাইরে বেরিয়ে গেলেও একেবারে চলে যায়নি, কক্ষের বাইরে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলো। খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠলো রহমান। সর্দার যা পারেন নি, রহমান নিজে যা পারেনি, সে দুর্লভ শুভ লগ্ন মুহূর্তকে নূরী আর মনিরা নিজে অভিনন্দন জানিয়ে বরণ করে নিয়েছে। এমন খুশি বুঝি ইতিপূর্বে আর কোনোদিন হয়নি রহমান।

রহমান সেখানে আর এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে ছুটলো নাসরিনকে সংবাদটা দেবার জন্য।

কিন্তু কোথায় নাসরিন।

অনেক খোঁজাখুজির পর নাসরিনকে পেলো রহমান আস্তানার এক নিভৃত জায়গায়।

রহমান বললো–তোমাকে আমি খুঁজে ফিরছি আর তুমি এখানে? একটা শুভ সংবাদ নাসরিন, একটা শুভ সংবাদ!

নাসরিন তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে স্বামীর জামাটা আঁকড়ে ধরে বলে–আমার ফুল্লরার কোনো সন্ধান পাওয়া গেছে। আমার ফুল্লরার কোনো সন্ধান?

না, ফুল্লরার সন্ধান নয়, তার চেয়েও অনেক বেশি আনন্দের সংবাদ।

রহমানের কথায় মুখখানা গম্ভীর ম্লান হয়ে পড়লো নাসরিনের, ব্যথাভরা করুণ কণ্ঠে বললো–আমার ফুলুরার সন্ধানের চেয়ে আমার কাছে কি আর এমন সংবাদ হতে পারে যা বেশি আনন্দের। তোমরা কেউ আমার দুঃখ, আমার ব্যথা বুঝবে না, কেউ তোমরা ভাবব না ফুল্লরার কথা। আমি দিন দিন নিরাশ হয়ে যাচ্ছি, আর বুঝি সে কোনোদিন ফিরে আসবে না।

অমন কথা ভেবো না নাসরিন, অমন কথা ভেবো না। তোমার ফুল্লরা যেখানেই থাক সে ভাল আছে আর ভাল থাকবে ও। মালোয়া ওকে নীলমনি পাথরের লোভে চুরি করে নিয়ে গেলেও তার সে কোনো অমঙ্গল সাধন করতে পারবে না, কারণ সর্দারকে সে ভালভাবেই জানে।

কিন্তু......

নাসরিন, তুমি হয়তো জানো না আস্তানার প্রতিটি ব্যক্তি আজ ফুল্লরার জন্য চিন্তিত, ব্যথিত ও দুঃখিত। সর্দারও নিশ্চিন্ত নন, তিনি সব সময় ভাবছেন ফুল্লরার কথা এবং সন্ধান করে ফিরছেন। তোমার ভাবনার চেয়ে অনেক বেশি ভাবনা আছে সর্দারের। তুমি জেনে রাখো আমাদের ফুরাকে সর্দার খুঁজে বের করবেনই। হাঁ, যে আনন্দ সংবাদের কথা বলছিলাম তা সত্যি অপূর্ব—এমন দৃশ্য কোনোদিন দেখবো ভাবতে পারি নি। বলো তো নাসরিন কি সে অপূর্ব দৃশ্য কোনোদিন

দেখবো ভাবতে পারি নি। বলো তো নাসরিন কি সে অপূর্ব দৃশ্য যা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি।

আমি কেমন করে বলবো বলো?

বলতে পারলে না তো? শোন নাসরিন, বৌরাণী আর নূরীর মিলন ঘটেছে।

সত্যি বলছো?

হাঁ।

মনিরা আপা নুরীর আসল পরিচয় জানতে পেরেছে?

শুধু নূরীর আসল পরিচয় নয়, জাভেদের আসল পরিচয়ও জানতে পেরেছেন বৌরাণী এবং তাকে বুকে টেনে নিয়ে আদর করলেন তিনি। নাসরিন, যে কারণে আমাদের সর্দারের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিলো তার সমাধান হয়েছে। বৌরাণী নূরী আর জাভেদকে মেনে নিয়েছেন....কি যে আনন্দ, কি যে তৃপ্তি, নাসরিন তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না।

রহমান আস্তানায় বসে যখন এসব আলাপ–আলোচনা করছিলো তখন বনহুর অশ্বপৃষ্ঠে চলেছে। কোথায় চলেছে সেই জানে। কান্দাই পর্বতসীমা অতিক্রম করে যখন বনহুর সমুদ্রতীরে পৌঁছলো তখন বেলা শেষ হয়ে এসেছে।

বনহুর দেখলো সমুদ্রতীর জনশূন্য।

কোনো একজনের আগমন প্রতীক্ষা করছে বনহুরমাঝে মাঝে সে তাকাচ্ছে, দূরে অনেক দূরে সমুদ্র বুকে কিন্তু কিছুই নজরে পড়ছে না, শুধু থৈ থৈ পানি আর পানি।

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দূরে একখানা বড় পালতোলা নৌকা নজরে পড়লো। একটা উচ্ছল দীপ্ত ভাব ফুটে উঠলো বনহুরের চোখেমুখে। তাজের লাগাম ধরে বনহুর দূরে একটা পাথরখন্ডের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো সে।

নৌকা ভিড়লো তীরে।

একদল জমকালো পোশাকপরা লোক নামলো নৌকা থেকে। তাদের মধ্যে একজন নারী বলে মনে হলো।

নৌকা থেকে নেমে সবাই গোল হয়ে দাঁড়ালো।

নারীমূর্তির মুখ আবরণে ঢাকা।

লোকগুলো কোনো আদেশের অপেক্ষা করতে লাগলো।

নারীমূর্তিটি কে এবং কি কারণে তারা এই সময়ে এখানে আগমন করেছে সব জানে বনহুর। অবশ্য সেজন্যই তারও আগমন ঘটেছে এখানে।

নারীমূর্তি কি করে জানবার জন্য বনহুর উন্মুখ হয়ে প্রতীক্ষা করছে। সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমেই জমাট বেঁধে উঠছে এবং সে কারণেই বনহুরকে তারা দেখতে পাচ্ছে না।

নারীমূর্তি বললো–জানো এখানে তোমাদেরকে কেন এনেছি।

সবাই নীরব, কেউ কোনো কথা বলছে না।

নারীমূর্তি বললো–এবার থেকে তোমরা সোজা চলে যাও, বেশ কিছুটা পথ চলার পর পাবে কান্দাই পর্বতমালা। সেই পর্বতমালার পাশ কেটে যাবে তোমরা সোজা দক্ষিণ দিকে। দক্ষিণ দিকে দেখবে ঘন জঙ্গল। সেই জঙ্গল অতিক্রম করে এতে থাকবে, দূরে দেখবে একটা পোড়োবাড়ি। ঐ পোড়াবাড়িখানা বাইরে থেকে দেখে কোনোরকম বুঝবার যো নেই যে, ঐ বাড়িখানার গভীর অতলে রয়েছে দস্যু বনহুরের আস্তানা। তোমরা কৌশলে পোড়োবাড়িখানার আশেপাশে জঙ্গলে আত্নগোপন করে থাকবে, দেখবে যেন কেউ টের না পায়।

রাণীজী, আপনার আদেশমতই কাজ হবে।

দেখবো তোমরা আমার আদেশ পালনে কতখানি সমর্থ হয়েছে। হাঁ শুনে রাখো আমি ঠিক সময় পৌঁছে যাব। আমার সঙ্গে থাকবে রেশমী নেট, যা মুঠার মধ্যে আমি লুকিয়ে রেখে কাজ উদ্ধার করবো। এখন বুঝতে পারছো এখানে আমার আগমন কি কারণে?

একজন অনুচর বললো– রাণীজী, বুঝতে পেরেছি। দস্যু বনহুর আমাদের এতগুলো লোককে থোকা দিয়ে তার স্ত্রীসহ পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে–এ শুধু আমাদের অপমান নয়, একেবারে……

যাক, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই দিলদার, তোমরা রওনা দাও।

আপনি!

আমি আপাততঃ নৌকার মধ্যে অপেক্ষা করবো। রহমাত রুহীকে নিয়ে পৌঁছে গেলেই আমি রওনা দেবো। খুব সতর্কতার সাথে কাজ করতে হবে মনে রেখ দিলদার।

সব মনে থাকবে রাণীজী! বললো দিলদার।

সবাই অভিনব কায়দায় রাণীজীকে অভিবাদন জানালো, তারপর চলে গেলো দ্রুত পদক্ষেপে।

ওরা চলে যেতেই দস্যুরাণী নৌকার দিকে পা বাড়ালো। দস্যুরাণী এবং তার অনুচররা যে জায়গায় দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছিলো সেখান থেকে সমুদ্রতীর বেশ খানিকটা পথ। কাজেই নৌকার মাঝি–মাল্লারা কেউ দস্যুরাণীর কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছিলো না বা সবকিছু তাদের নজরে পড়ছিলো না।

মাঝিরা নৌকার রান্নাবান্নার আয়োজন করে নিতে ব্যস্ত ছিলো।

দস্যুরাণী এগিয়ে যাচ্ছে নৌকার দিকে। সে কৌশলে বনহুরকে পাকড়াও করবে এবং তাকে পাকড়াও করে নিয়ে যাবে তার নিজের আস্তানায়। বনহুরের উপর তার ভীষণ রাগ রয়েছে।

বনহুর তাজের পিঠে হাত বুলিয়ে তাকে চুপ থাকতে বললো। তারপর সে আড়াল থেকে বেরিয়ে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দস্যুরাণীর সম্মুখে এসে পথরোধ করে দাঁড়ালো।

দস্যুরাণী আচমকা চমকে উঠলো, বললো–কে তুমি?

বনহুর চাপাকণ্ঠে বললো–যাকে পাকড়াও করবার জন্য একটু পূর্বে তুমি তোমার অনুচরদের নির্দেশ দিলে।

দস্যু বনহুর! তুমি....

হা রাণী, হাঁ।

তুমি–তুমি কি করে...

জানলাম–এই তো?

হাঁ, হাঁ, শয়তান।

ছিঃ ঐ অশোভনীয় উক্তি তোমার মুখে শোভা যায় না, বিশেষ করে আমার জন্য, কারণ শয়তান আমি নই...।

বনহুর!

কই পাকড়াও করো!

দস্যুরাণী দাঁতে দাঁত পিষলো, রাগে তার চোখমুখ রাঙা হয়ে উঠেছে কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকার জমাট হওয়ায় তার মুখমন্ডল নজরে পড়ছিলো না। কি করবে দস্যুরাণী, যদিও তার কোমরের বেল্টে আছে আগ্নেয়াস্ত্র–তবু সে তা ব্যবহার করতে পারছে না। বললো–এ মুহূর্তে নাহোক যে কোনো সময় তোমাকে আমি পাকড়াও করবোই!

তোমাকে সে সুযোগ দিলে তো। জানো এই দন্ডে আমি তোমাকে পাকড়াও করতে পারি?

দস্যুরাণী কোনো জবাব দিলো না, সে বনহুরের পাশ কাটিয়ে নৌকার দিকে পা বাড়ালো।

বনহুর পুনরায় পথ আগলে দাঁড়ালো কোথায় যাচ্ছে রাণীজী?

নৌকায়!

না, ওখানে যেতে তুমি পারবে না।

যতক্ষণ আমাকে তুমি বন্ধু বলে গ্রহণ না করো।

বন্ধু!

হাঁ।

না, তা হয় না, তোমাকে আমি বন্ধু বলে গ্রহণ করতে পারি না।

তাহলে তোমার অনুচররা ফিরে আসবার পূর্বেই তোমাকে আমি আমার আস্তানায় নিয়ে ফিরে যাবো, কেউ তোমার সন্ধান পাবে না।

বনহুর, পথ ছাড়ো…সঙ্গে সঙ্গে বেলটে হাত দিতে যায় দস্যুরাণী।

বনহুর খপ করে দস্যুরাণীর হাতখানা চেপে ধরলো।

দস্যুরাণী একচুল হাত নড়াতে পারলো না।

পরমুহূর্তে বনহুর মুক্ত করে দিলো ওর হাতখানা, তারপর বললো–বলো বন্ধু বলে মেনে নিচ্ছো আমাকে?

দস্যুরাণী কোনো কথা বলে না।

কি, চুপ করে আছো কেন?

গম্ভীর কণ্ঠে বললো দস্যুরাণী–নিলাম।

সত্যি!

তাহলে তোমার নৌকায় নিয়ে চলো কিন্তু সবাইকে তুমি আমাকে বা বলে পরিচয় দেবে। যদি কোনো অভিসন্ধি আঁটো, তাহলে উদ্ধার নেই, বুঝলে?

দস্যুরাণী কোনো কথা বললো না।

এবার দস্যুরাণী এগুলো নৌকার দিকে।

বনহুর তাকে অনুসরণ করলো।

চলতে চলতে বললো দস্যুরাণীবনহুর, আমার চেয়েও তুমি চতুর তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আচ্ছা, একটা কথার জবাব ঠিকমত দেবে?

যদি দেবার মত হয় দেবো।

আমি তোমাকে পাকড়াও করার উদ্দেশ্য নিয়ে এই পথে এলাম, একথা তুমি টের পেলে কি করে?

ও, এই কথা!

হাঁ, সঠিক জবাব দেবে!

আমি কোনো সময় বেঠিক জবাব দেই না।

তাহলে আমি যে প্রশ্ন করলাম তার জবাব দাও?

তোমার শয়নকক্ষের টেবিলের নিচে আমি আমার ক্ষুদে ওয়্যারলেস যন্ত্র বসিয়ে রেখে এসেছিলাম। তুমি ঐদিন এবং তার পরদিন তোমার শয়নকক্ষে যেসব কথা বলছো আমি তা আমার ওয়্যারলেসে শুনতে পেরেছি। তুমি তোমার অনুচর রহমতকে গোপনে নির্দেশ দিয়েছো?

হাঁ, আমি আমার বিশিষ্ট অনুচর রহমতকে বলেছিলাম কিন্তু আমার অপর কোনো অনুচরকে এই পথের সন্ধান দেইনি। আমি এখানে এসে আমার অনুচরদের যেভাবে নির্দেশ দিলাম তা তুমি শুনেছো?

হা শুনেছি এবং তুমিও বুঝতে পারছো আমি কিভাবে তোমার সব কথা জানতে পেরেছি।

তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান।

এ কথা তুমি কেন, সবাই বলে।

কিন্তু একটা কথা মনে রেখো বনহুর, বুদ্ধিমান হলেও তুমি আমার কাছে পরাজয় বরণ করেছিলে!

আমি তা স্বীকার করি না, কারণ পরাজয়বরণ করবে তখন যখন তোমার বিচার আসনের সম্মুখে হাজির হবো।

ও, তুমি তাহলে,..

দস্যুরাণীর কথার মাঝে বলে উঠে বনহুর–হাঁ, আমি কোনোদিন কারও কাছে পরাজয় বরণ করিনি দস্যুরাণী।

নানা কথার মাঝে তারা নৌকার কাছাকাছি পৌঁছে গেলো।

মাঝি মাল্লারা তখন রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত ছিলো।

একজন প্রবীণ মাঝি এগিয়ে এলো–রাণীজী!

প্রবীণ মাঝি রাণীজীর সঙ্গে একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখে অবাক হয়েই এগিয়ে এসেছিলো।

দস্যুরাণী কি জবাব দেয় জানার জন্য বনহুর তাকালো তার মুখের দিকে।

দস্যুরাণী বললো–আমার বন্ধু।

প্রবীণ মাঝি সরে দাঁড়ালো কুর্ণিশ জানিয়ে।

বনহুর নৌকায় উঠে দাঁড়ালো, তারপর হাত বাড়ালো দস্যুরাণীর দিকে।

অগত্যা দস্যুরাণী হাত রাখলো বনহুরের হাতের উপর।

বনহুর আলগোছে তুলে নিলো দস্যুরাণীকে।

অবশ্য দস্যুরাণী মনে মনে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছিলো, কারণ সে কোনো সময় চায় না তাকে কেউ সাহায্য করে। একেই দস্যুরাণীর ভীষণ রাগ ছিলো বনহুরের উপর কিন্তু এখন সে বাধ্য হয়ে সেই রাগ। চেপে কুঁকড়ে আছে।

বনহুর এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন দস্যুরাণী তার অনেক দিনের চেনা। বললো বনহুর–রাণীজী, বড় ক্ষুধা পেয়েছে।

দস্যুরাণীর মুখমন্ডল কঠিন হয়ে উঠলো, কিন্তু সে কিছু বলতে পারছে না। মনের ক্রুদ্ধভাব দমন করে প্রবীণ মাঝিকে লক্ষ্য করে বললো–তোমাদের রান্না কত দূর বাকি?

এই তো হলো রাণীজী!

বললো দস্যুরাণী–যাও, শিগগির খাবার নিয়ে এসো।

নৌকার পিছন দিকে চলে যায় প্রবীণ মাঝি।

দস্যুরাণী বললো–তুমি যেমন এসেছো তেমনি আলগোছে চলে যাও বনহুর, নইলে আমি.....

কি করবে?

আমার অনুচরগণ ফিরে এলে তুমি নিস্তার পাবে না।

কেন, তুমি তাদের কাছে বন্ধু বলে আমার পরিচয় দেবে না?

দিলেও তারা বিশ্বাস করবে না, কারণ এমন স্থানে এমন অসময়ে আমার কোনো বন্ধু এখানে আসতে পারে না–এটাই তাদের ধারণা। কাজেই তোমাকে তাদের ফিরে আসার পূর্বেই সরে পড়তে হবে। তা ছাড়াও তোমাকে আমার অনুচরদের মধ্যে বেশ কিছু লোক চেনে যারা তোমাকে পূর্বে দেখেছে।

তুমি ভেবো না রাণীজী, তেমন কোনো অসুবিধা হবে না। তারা পৌঁছবার পূর্বেই আমি চলে যাবো।

ঠিক?

হাঁ ঠিক।

বলো এখন কি চাও?

তোমার সঙ্গে সন্ধি করে চলতে চাই। বন্ধু বলে আজ যেমন মেনে নিলে তেমনি সব সময় মেনে নেবো।

বেশ, কথা দিচ্ছি তাই করবো। তোমার মত বন্ধু থাকা মন্দ নয়। কিন্তু মনে রেখো বনহুর, আমার পিছু লাগলে আমি তোমাকে ক্ষমা করবো না……

আর তুমিও মনে রেখো রাণীজী, যদি কোনো সময় আমি তোমার মধ্যে ত্রুটি লক্ষ্য করি তাহলে তুমিও রেহাই পাবে না। আচ্ছা আজ তাহলে চলি রাণীজী?

কথাটা শেষ করেই বনহুর নৌকা থেকে তীরে নেমে পড়ে এবং অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

দস্যুরাণী থ' মেরে দাঁড়িয়ে থাকে নৌকার উপর।

একটু পরেই সে শুনতে পায় অশ্বপদশব্দ। বুঝতে পারে এ অশ্বপদশব্দ বনহুরের অশ্বের। একটা মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠে তার ঠোঁটের ফাঁকে।

ততক্ষণে বনহুরের অশ্বপদশব্দ দূরে অনেক দূরে সরে গেছে।

*

বনহুর আস্তানায় পৌঁছতেই রহমান এবং কায়েস এসে দাঁড়ালো দু'জন দু'পাশে। রহমানের মুখমন্ডল দীপ্ত উজ্জ্বল, খুশিতে উচ্ছল সে। কায়েসের মুখেও হাসির আভাস।

বনহুর চট করে কিছু বুঝতে পারলো না, সে মনে করলে তাকে ফিরে পেয়ে খুশি হয়েছে এরা।

এগুলো বনহুর আস্তানার অভ্যন্তরে।

রহমান মনিরা আর নূরীর মিলন কাহিনী বলবে বলবে করছে, ঠিক এমন সময় বললো বনহুর– রহমান, একটা জরুরি কাজ আছে। এই মুহূর্তে তোমরা প্রস্তুত হয়ে নাও।

সর্দার!

সব জানতে পারবে। যাও আমার অনুচরদের সবাইকে তৈরি হয়ে নিতে বলল। বনহুরের কণ্ঠস্বর গম্ভীর।

রহমান যা বলতে চেয়েছিলো তা বলা হলো না তখন। সে চলে গেলো অনুচরদের কাছে এবং তাদের সবাইকে প্রস্তুত হতে নির্দেশ দিলো।

বনহুর আস্তানার অভ্যন্তরে প্রবেশ না করে দরবারকক্ষের দিকে এগুলো, সেখানে পৌঁছে জমকালো পোশাক পরে নিলো।

ততক্ষণে অনুচরগণ তৈরি হয়ে দরবারকক্ষে প্রবেশ করলো এবং সর্দারকে কুর্ণিশ জানালো।

বনহুর বললো–তোমরা এই মুহূর্তে আস্তানার আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ো। এমনভাবে ছড়িয়ে পড়বে যাতে কেউ পালাতে না পারে, বুঝলে? কারণ একদল শক্ত ওৎ পেতে আছে।

শত্রু ওৎ পেতে আছে, বলেন কি সর্দার! বললো কায়েস।

বনহুর বললো–হাঁ, আর বিলম্ব করো না, যাও।

বনহুর আর রহমান পা বাড়ালো আস্তানার বাইরে। তার অনুচরগণ তাকে অনুসরণ করলো।

*

এসো মনিরা আপা, তোমাকে আমি সবকিছু দেখাবো, যা তুমি দেখতে চাও।

সত্যি নূরী, তুমি কত ভাল! চলো আমায় তুমি কোথায় নিয়ে যাবে?

তোমার স্বামীর আস্তানা তুমি ঘুরে ফিরে দেখবে চলো।

চলো।

পাশাপাশি দু'জন এগুলো।

নূরী বললো–মনিরা আপা, প্রথম তুমি কোন দিকটা দেখতে চাও? দক্ষিণে অস্ত্রাগার, উত্তরে দরবারকক্ষ মানে দরবারগুহা, পূর্বদিকে স্নানাগার, আর পশ্চিমদিকে বন্দীশালা–বলো কোনদিকে যাবে?

মনিরা বললো–আমার ইচ্ছা আমি প্রথমে দরবারকক্ষ দেখবো।

কিন্তু

বল, থামলে কেন?

শুনেছি কয়েকজন শত্রু ধরা পড়েছে। সর্দার নাকি তাদের বিচার করছে.....

সেই তো ভাল হবে নূরী, আমি তো কোনোদিন ওর দরবারকক্ষ দেখিনি বা ওর বিচার দেখিনি। আজ নিজের চোখে ওর কার্যকলাপ দেখবো।

বেশ চলো, তবে গোপনে যেতে হবে।

তাই যাবো, আড়াল থেকে দেখব তোমার বনহুর কিভাবে বিচার করে।

ওরা দু'জন চুপি চুপি দরবারকক্ষের পিছনে এসে দাঁড়ালো। ওপাশে ছোট্ট একটা গবাক্ষ ছিলো, সেই গবাক্ষপথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো মনিরা আর নূরী।

মনিরার দু'চোখে বিস্ময় ফুটে উঠলো, স্বামীকে সে কোনোদিন এমন অবস্থায় দেখেনি। এ দৃশ্য তার মনকে শুধু বিস্মিতই করলো না, মুগ্ধও করলো। অভিভূত হলো সে। স্বামীকে মনিরা আজ নতুন রূপে দেখলো। সুউচ্চ আসনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে বনহুর। পাশে রহমান আর কায়েস। তাদের শরীরেও জমকালো পোশাক।

বনহুরের অনুচরগণ দরবারের দু'পাশে অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত অবস্থায় দন্ডায়মান।

সম্মুখে বেশ কিছু সংখ্যক লোককে পিছমোড়া অবস্থায় বাধা দেখা যায়। তাদের দেহেও জমকালো পোশাক, মুখে গালপাট্টা বাঁধা।

মনিরা অবাক হয়ে দেখতে লাগলো।

বনহুরের দরবারকক্ষ বিরাট ছিলো, কাজেই এতগুলো লোক থাকা সত্ত্বেও বেশ ফাঁকা ছিলো চারদিক। বনহুরের কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি কেঁপে কেঁপে উঠছিলো দরবারকক্ষের মধ্যে।

মনিরা বিস্মিত হতবাক।

নূরী এ দৃশ্য বহু দেখেছে, তাই এসব তার অভ্যাস আছে। সে অবাক হয়নি মোটেই, তবু মনিরার পাশে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করছিলো।

বিচার শেষ হলো।

বন্ধন অবস্থায় লোকগুলোকে বনহুরের অনুচরগণ নিয়ে বেরিয়ে গেলো বন্দীশালার দিকে কিন্তু নিয়ে যাবার পূর্বে প্রত্যেকটা বন্দীর চোখে কালো কাপড় বেঁধে দেওয়া হলো।

ওরা বেরিয়ে যাবার পরও কয়েকজন অনুচর রয়ে গেলো, তারা অভিবাদন জানালো বনহুরকে।

রহমান বললো–সর্দার!

বনহুর বললো–জানি, তোমরা জানতে চাও এরা কারা? এবং এরা কি কারণে কান্দাই জঙ্গলের মধ্যে এভাবে লুকিয়ে ছিলো?

হাঁ হাঁ সর্দার, জানতে চাই আমরা? বললো এবার কায়েস।

রহমানও বললো–হা সর্দার, আমরা এখনও বুঝতে পারছি না এরা কারা এবং কেন এরা এখানে মানে কান্দাই জঙ্গলে এসেছিলো?

এরা দস্যুরাণীর অনুচর।

বলেন কি সর্দার!

হাঁ, দস্যুরাণী এদের পাঠিয়েছে আমাকে যেমনভাবে তোক পাকড়াও করে নিয়ে যাবার জন্য কিন্তু আমি একথা পূর্বেই জানতে পেরেছিলাম এবং সেইদিন আমি দস্যুরাণীর নিকটে উপস্থিত হয়েছিলাম.......

সর্দার!

হাঁ, আমি তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সোজা চলে গিয়েছিলাম কান্দাই সমুদ্রতীরে, কারণ আমি জানতে পেরেছিলাম দস্যুরাণী তার কিছুসংখ্যক অনুচর নিয়ে আমাকে পাকড়াও করার জন্য নৌকাযোগে আগমন করছে। আমি সেই

মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করার জন্য আগে থেকেই সেখানে উপস্থিত হই.......পরের ঘটনা বনহুর সংক্ষেপে রহমান এবং কায়েসের কাছে বললো।

আড়াল থেকে সব শুনলো মনিরা আর নূরী। তারাও কম অবাক হলো না। দক্ষ বুদ্ধিমত্তার জন্য স্বামীকে মনে মনে ধন্যবাদ জানালো।

সত্যিই বনহুর যদি তার ক্ষুদে ওয়্যারলেস যন্ত্র ঠিকমত জায়গায় চালু অবস্থায় রেখে আসতে না পারতো তাহলে সে কিছুতেই এভাবে জয়ী হতো না।

বনহুর অনুচরদের লক্ষ্য করে বললো–বন্দীদের প্রতি অত্যন্ত সর্তক থাকবে। দস্যুরাণী আমাকে পাকড়াও করতে পাঠিয়েছিলো, তাই আমি এদের পাকড়াও করলাম। হাঃ হাঃ হাঃ...অট্টহাসিতে ফেটে পড়ো বনহুর।

মনিরার দু'চোখে বিস্ময় ঝরে পড়ছে।

নূরী বললো–চলো এবার তোমাকে দক্ষিণে নিয়ে যাই।

চলো।

আঁকাবাকা পথ অতিক্রম করে চললো তারা। পথ মানে সোজা প্রশস্ত পথ নয়, ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গপথ। মাঝে মাঝে দেয়াল, দেয়ালের স্থানে স্থানে নানা রকম অদ্ভুত ছিদ্রপথ, ঐ ছিদ্রপথে সুইচ বসানো আছে। কোন্ ছিদ্রপথের সুইচ চাপ দিলে কোন পথে যাওয়া যাবে জানে নূরী।

মনিরা অবাক হয়ে দেখছিলো।

এমন অদ্ভুত কান্ডকারখানা সে কোনোদিন দেখেনি। একটা সুইচে চাপ দিতেই দেয়ালে একটা সুড়ঙ্গপথ বেরিয়ে এলো। ওপাশে কয়েকটা সিঁড়ির ধাপ রয়েছে। নূরী বললো–এসোর।

মনিরা আর নূরী প্রবেশ করলো সুড়ঙ্গপথে।

একটু এগুতেই প্রশস্ত সুড়ঙ্গপথ। তারপর কিছু দেয়াল, দেয়ালের পাশ কেটে এগুতে লাগলো ওরা দু'জন। মনিরা যত দেখে ততই অবাক হচ্ছে। যদিও সে

একবার বনহুরের আস্তানায় এসেছিলো কিন্তু এমনভাবে সে দেখবার সুযোগ পায়নি কিছু।

কিছুদূর এগুতেই বনহুরের অস্ত্রাগার নজরে পড়লো। অস্ত্রাগারের দরজায় দু'জন পাহারাদার অস্ত্র কাঁধে দাঁড়িয়ে আছে।

নূরীকে দেখামাত্র প্রহরীদ্বয় কুর্ণিশ জানালো।

নূরী বললো–অস্ত্রাগারের দরজা খুলে দাও।

প্রহরীদ্বয় দরজার তালা খুলে দিলো।

নূরী আর মনিরা প্রবেশ করলো অস্ত্রাগারের ভিতরে। সেকি ভীষণ আর ভয়ঙ্কর স্থান দস্যু বনহুরের অস্ত্রাগার। এক এক ধরনের অস্ত্র এক এক জায়গায় স্তূপাকার করে রাখা হয়েছে। সেকি ভীষণ আর অদ্ভুত সব অস্ত্র যার নামও অনেকে জানে না সে। অবশ্য সবগুলো অস্ত্রই নূরীর পরিচিত, অনেক অস্ত্র সে ব্যবহার করতেও জানে।

মনিরার দু'চোখে রাজ্যের বিস্ময়, স্বামীর অস্ত্রাগার তার কাছে অদ্ভুত বিস্ময় বলে মনে হয়।

সব দেখলো সে ঘুরেফিরে।

ওপাশেই একটা কক্ষ, তার মধ্যে এবার প্রবেশ করলো ওরা।

নূরী বললো–এ কক্ষে যে সব অস্ত্র দেখছে। এগুলো বনহুরের নিজস্ব অস্ত্র। এ অস্ত্র বনহুর নিজে ব্যবহার করে।

মনিরা অস্ত্রগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে নির্ণিমেষ নয়নে। অস্ত্রগুলোতে তার স্বামীর ছোঁয়া লেগে আছে যেন। মনিরা অবাক চোখে দেখছে কতকটা সম্বিৎহারার মত।

নূরী হেসে বললো–মনিরা আপা, চলো এবার পূর্বদিকে যাই।

সম্বিৎ ফিরে পেলো মনিরা, বললো–চলো।

আবার এগুলো তারা।

এবার সুন্দর পরিচ্ছন্ন সুড়ঙ্গপথ, সুড়ঙ্গের দু'পাশে মনোরম কারুকার্য খচিত দেয়াল। কিছুদূর অগ্রসর হবার পর প্রশস্ত পথ এবং সেখানে আকাশ দেখা যায়। অদূরে স্নানাগার–সচ্ছ পানির বুকে সূর্যের আলো ঝলমল করছে।

নীলাভ পানিতে সূর্যের আলো অপরূপ লাগছে। মনিরা বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকে স্নাগারের দিকে।

নীল আকাশের প্রতিচ্ছবি পানির বুকে কেঁপে কেঁপে দোল খাচ্ছিলো।

মনিরা ভাবছে এই স্নানাগারে তার স্বামী স্নান করে। দুটি বাহু প্রসারিত করে সাঁতার কাটে সে। উপরে আকাশ আর চারপাশে পর্বতের দেয়াল–এ যেন এক অদ্ভুত অপূর্ব সৃষ্টি। সচ্ছ নীল পানির মধ্যে মনিরা যেন স্বামীর প্রতিবিম্ব দেখতে পায়–দেখতে পায় প্রাণ খুলে সাঁতার কাটছে তার স্বামী। দু'পাশে ঢেউগুলো তার দেহ স্পর্শ করে ফিরে আসছে তীরের দিকে। বুদবুদগুলো ফুলের মালার মত অভিনন্দন জানাচ্ছে, তাকে জড়িয়ে ধরছে। হাসছে বনহুর, এসো, তীরে দাঁড়িয়ে কি দেখছ? ও যেন হাত বাড়িয়ে দিয়ে ডাকছে তাকে। ঐ তো সেই মুখ, সেই বলিষ্ঠ বাহু, সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিময় দুটি চোখ.....মনিরার মুখমন্ডলে একটা দীপ্ত হাসির আভাস ফুটে উঠে।

নূরী তাকিয়ে ছিলো মনিরার মুখের দিকে, বললো–কি ভাবছো মনিরা আপা?

না না, কিছু না।

স্নানাগার কেমন লাগছে তোমার?

অপূর্ব।

স্নান করবে? এস আমরা স্নান করি!

না, এখন নয়, পশ্চিম দিকে দেখা শেষ করে তারপর।

কিন্তু পশ্চিমে যাওয়া চলবে না মনিরা।

অকস্মাৎ চমকে উঠলো মনিরা আর নূরী, ফিরে তাকালো উভয়ে। তারা দেখতে পেলো তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে বনহুর। তার দেহে তখনও সেই জমকালো পোশাক রয়েছে, যে পোশাকে মনিরা কিছু পূর্বে তার স্বামীকে দরবার কক্ষের বিচারাসনের পাশে দাঁড়িয়ে বিচার করতে দেখছিলো।

মনিরা স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে সহসা দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারে না যেন। সে কিছু পূর্বে দরবারকক্ষে স্বামীর যে রূপ দেখেছে তা এখনও তার দৃষ্টিপথ থেকে মুছে যায় নি। সে এক বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বপূর্ণ দীপ্তময় পুরুষ, যার তুলনা হয় না এ কালের কোনো পুরুষের সঙ্গে।

মনিরা আর নূরীকে লক্ষ্য করে বললো বনহুর–তোমাদের অপূর্ব মিলন আমাকে অভিভূত করেছে। জানতাম তোমরা আমাকে নিজ নিজ গুণে ক্ষমা করে দেবে।

নূরী ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছিলো বনহুর আর মনিরার অলক্ষ্যে। বনহুর বললো–যেও না নূরী, আরও কথা আছে তোমাদের সঙ্গে।

বনহুর এক হাতে মনিরার হাত তুলে নিলো, অপর হাতে তুলে নিলো নরীর হাতখানা, বললো সত্যি করে বলল দেখি তোমরা উভয়ে উভয়কে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছো?

মনিরা আর নূরী তাকালো দু'জন দু'জনের মুখের দিকে।

বনহুর মৃদু হাসে।

মনিরা বলে উঠে হাঁ, আমি ওকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছি।

অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো বনহুর–মনিরা! একটু থেমে বললো আবার সে–আমি রহমানের মুখে সব জেনেছি। তবু নিজে জানতে চেয়েছিলাম। আমি খুশি হয়েছি মনিরা।

আমি রহমানের কাছে সব জেনেছি; তুমি নূরীকে গ্রহণ করোনি, মূল্য দিয়েছো তার প্রেম–ভালবাসার, যা তোমার পক্ষে কিছুতেই অস্বীকার করার উপায় ছিলো না।

হাঁ হাঁ মনিরা।

তুমি যেমন ওর প্রেম–ভালবাসাকে অস্বীকার করতে পারোনি তেমনি আমিও পারলাম না ওর নিবিড় সম্বন্ধকে বিচ্ছিন্ন করতে, তাইতো ওকে আমি সাদরে গ্রহণ করলাম যেমন তুমি করেছিলে একদিন।

মনিরা!

হাঁ! তুমি আমার স্বামী, তুমি চিরদিন আমারই থাকবে।

এসো আমার স্নানাগারে স্নান করি। সার্থক হবে আমার স্নানাগার তোমাদের পরশে……এসো মনিরা, এসো নূরী।

বনহুর নূরী আর মনিরাকে নিয়ে স্নানাগারের পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো। কাউকে সে ভাবতে সময় দিলো না।

বললো মনিরা–একি করলে?

হাঁ, আমি দেখতে চাই আমাকে কে আগে ধরতে পারো, বুঝবো সেই আমাকে বেশি ভালবাসে।

মনিরা বললো–হাঁ, তাই হোক! নূরী, এসো আমরা পাশাপাশি দাঁড়াই,

আর আমি থাকবো তোমাদের চেয়ে কয়েক হাত দূরে। বললো বনহুর।

তাই হোক, বললো মনিরা।

নূরী কিন্তু নীরব, কারণ সে চায় মনিরা যা ভালবাসে তাই করুক, তাতেই সে খুশি হবে।

বনহুর সাঁতার দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে মনিরা আর নূরী তাকে ধরবার জন্য সাঁতার কাটতে শুরু করলো।

উচ্ছল হয়ে উঠলো ওরা দুজন, বনহুরকে যে সর্বপ্রথম স্পর্শ করতে সক্ষম হবে সেই হবে জয়ী। প্রাণপণে সাঁতার দিতে লাগলো উভয়ে।

বনহুর সাঁতার কাটছে আর মাঝে মাঝে পিছন ফিরে দেখে নিচ্ছে মনিরা আর নূরীকে।

বনহুরকে ধরবার কার সাধ্য যদি ইচ্ছা করে সে ধরা না দেয়।

সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে সাঁতার দিয়েছে বনহুর। সাইক্লোনের তান্ডব তার গতিরোধ করতে পারেনি। প্রচন্ড জলোচ্ছাস তাকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়নি কোনোদিন। আজ বনহুরকে পাকড়াও করবে দু'জন নারী...সাঁতার কাটতে কাটতে আপন মনে হাসে বনহুর।

মনিরাও সাঁতার জানে, কলেজের সাঁতার প্রতিযোগিতায় সে অনেকবার ফাষ্ট হয়েছে পুরস্কার পেয়েছে। মনিরা অনেক কিছু। একবার সে সোনার মেডেল পেয়েছিলো তারে।

আজ মনিরা স্বামীর ভালবাসার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। অফুরন্ত উদ্দীপনা নিয়ে সাঁতার কাটছে সে–আজ তাকে জয়ী হতেই হবে।

নূরীও নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে সাঁতার কাটছে। আজ তাকে জিততেই হবে। নূরী ঝর্ণার পানিতে সাঁতার কেটেছে, বনহুরের সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে সে বহুবার। আজ তার জীবনে চরম এক সাঁতার প্রতিযোগিতা।

আকাশে হাল্কা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে।

সূর্যের রশ্মি মাঝে–মধ্যে স্নাগারের পানিতে সোনালি আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে।

সাঁতার কাটছে এরা।

হাঁপিয়ে উঠেছে মনিরা।

নূরী ঠিক মনিরার কাছাকাছি আছে। পাশাপাশি চলেছে ওরা দুজন।

মাঝে মাঝে নূরী মনিরাকে ছাড়িয়ে যায় কিন্তু পরক্ষণেই আবার তারা সামনে এসে পড়ে।

বনহুর প্রায় মাঝামাঝি পৌঁছে গেছে।

এবার সে স্থির হলো পানির বুকে, কারণ তার সঙ্গে সাতারে পাল্লা দিয়ে কেউ জয়ী হতে পারবে না। কাজেই বনহুর এবার চুপ রইলো। কিন্তু সে লক্ষ্য করলো নূরী মনিরাকে ছাড়িয়ে এগুচ্ছে। মনিরা পিছিয়ে পড়েছে অনেকটা।

মনিরা প্রাণপণে নূরীকে পিছনে ফেলবার চেষ্টা করছে কিন্তু সে পূর্বের মত উচ্ছলতার সঙ্গে সাঁতার কাটতে সক্ষম হচ্ছে না।

বনহুর বুঝতে পারলো কে জয়ী হবে, তাই সে দুজনার অলক্ষ্যে ডুব দিলো।

নূরী আর মনিরা তো অবাক হয়ে গেলো–কোথায় বনহুর! উভয়ে একই জায়গায় এসে থেমে পড়লো।

ঠিক ঐ মুহূর্তে বনহুর অথৈ পানির মধ্যে একসঙ্গে ধরে ফেললো মনিরা আর নূরীকে। মাঝে বনহুর, তার ডান পাশে মনিরা, বাম পাশে নুরী।

আচমকা চমকে উঠেছিলো মনিরা আর নূরী।

বনহুর হেসে বললো–দেখো আমি তোমাদের দু'জনকে সমান ভালবাসি…… তাই প্রমাণ করলাম কেউ তোমরা কখনও আমার কাছে……

হাসতে লাগলো বনহুর–অপূর্ব উচ্ছল আনন্দভরা সে হাসি।

মনিরা আর নূরী স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলো।

*

দস্যুরাণীর ভারী বুটের শব্দ গুহার পাথরে মাটিতে একটা থমথমে ভাব সৃষ্টি করে চলেছে।

পাশে দন্ডায়মান চন্দনা।

গুহার দেয়ালে দপ দপ করে মশাল জ্বলছে। মশালের আলো গুহার জমাট অন্ধকারকে লালচে করে তুলেছে। কেমন যেন ভয়াবহ মনে হচ্ছে আলোটা।

অদূরে দন্ডায়মান রহমত, তার মুখমন্ডল ও কেমন যেন নিষ্প্রভ মনে হচ্ছে।

এমন সময় বাইরে শোনা যায় অশ্বপদশব্দ।

একটু পরেই গুহায় প্রবেশ করে দস্যুরাণীর একজন অনুচর। সে গুহায় প্রবেশ করে অভিবাদন জানালো দস্যুরাণীকে।

দস্যুরাণীর মুখমন্ডল গম্ভীর কঠিন, অনুচরটা গুহায় প্রবেশ করতেই পায়চারী বন্ধ করে বললো–কি সংবাদ বলো?

রাণীজী, আপনি যে সংবাদ শুনেছেন সেটাই ঠিক। আমাদের সবগুলো অনুচরকে বনহুর আটক করেছে......

এ সংবাদ তাহলে সঠিক?

হ্যাঁ, রাণীজী।

দাঁতে দাঁত পিষে বলল দস্যুরাণী–দস্যু বনহুর আমার অনুচরদের বন্দী করেছে। বেশ, আমিও দস্যু বনহুরকে দেখে নেবো। যেমন করে হোক তাকে আমি বন্দী করবোই এবং তার উপযুক্ত শাস্তি তাকে দেবো। কথাগুলো বলে বেরিয়ে গেলো দস্যুরাণী।

চন্দনা তাকালো রহমতের মুখের দিকে।

তাদের মুখমন্ডল গম্ভীর থমথমে হয়ে উঠলো। তারা বুঝতে পারলো দস্যু বনহুর আর দস্যুরাণী মিলে একটা লড়াই বাঁধবে এবং তার জন্য বহু ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে দু'জনকে।

দস্যুরাণী যেমন দুঃসাহসিকা, তেমনি দস্যু বনহুর দুঃসাহসিক–সিংহ আর সিংহীতে যুদ্ধ, কম কথা নয়!

চন্দনা বললো–রহমত, তুমি কৌশলে দস্যু বনহুরের কবল থেকে আমাদের অনুচরগণকে উদ্ধার করার চেষ্টা করো। রাণী ক্ষেপেছে, পরিস্থিতি ভয়াবহ দাঁড়াবে–অহেতুক রক্তক্ষয় হবে দু'পক্ষে।

রহমত চন্দনার কথায় কোনো জবাব দিতে পারলো না, কারণ দস্যু বনহুর সম্বন্ধে সে ভালভাবেই জানে সবকিছু।

চন্দনা বললো–অমন নীরব আছো কেন রহমত, জবাব দাও?

জবাব আমি খুঁজে পাচ্ছি না চন্দনা।

সত্যি, আমিও ভাবছি ব্যাপারটা যেন কেমন ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। একটু ভেবে বললো চন্দনা–এক কাজ করলে কেমন হয়?

বলো চন্দনা কি কাজ?

কাজ সহজ কিন্তু কাজ সমাধা করা কঠিন।

বেশ, বলোই না যদি কাজে আসে।

যেমন করে হোক দস্যু বনহুরকে হাতের মুঠায় আনতে হবে। তারপর তার দরবারে পৌঁছতে হবে, তারপর কৌশলে তার বন্দীশালায় পৌঁছে আমাদের অনুচরদের মুক্ত করে আনতে হবে। রহমত, তুমি আমাকে সাহায্য করলে আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি?

কিন্তু তুমি যত সহজ মনে করছো তত সহজ নয় ব্যাপারটা।

তবু চেষ্টা নিতে দোষ কি?

বেশ, তাই হবে।

বলো রাণীর কক্ষে গিয়ে তার সঙ্গে আলাপ করি।

মনে হয় রাণী সম্মত হবে না।

চলোইনা দেখা যাক। সহজে যদি কাজ হাসিল হয় তাহলে অহেতুক লড়াই ভাল নয়।

চলো।

রহমত আর চন্দনা দস্যুরাণীর বিশ্রামকক্ষের দিকে এগুলো।

দরজার নিকট পৌঁছে থমকে দাঁড়ালো চন্দনা আর রহমত।

রহমত বললো–যাও চন্দনা, তুমি রাণীর কাছে যাও এবং যা বলতে চাও বলো।

বেশ, তুমি এখানে অপেক্ষা করো। কথাটা বলে চন্দনা চলে গেলো দস্যুরাণীর বিশ্রামকক্ষের দিকে। কক্ষে প্রবেশ করেই দেখতে পেলো দস্যুরাণী শয্যায় গা এলিয়ে দিয়ে কিছু ভাবছে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে, পদশব্দে ফিরে তাকিয়ে চন্দনাকে দেখে সোজা হয়ে বসলো।

চন্দনা বললো–রাণী!

বল কি বলতে চাস?

রাণী, দস্যু বনহুরকে সম্মুখযুদ্ধে পরাজিত করা কঠিন হবে, তাই আমি চাই কৌশলে তাকে বন্দী করতে।

দস্যুরাণী শয্যায় দেহটা আবার এলিয়ে দিয়ে বললো–একবার নয়, দু'দুবার দস্যু বনহুর আমাকে জব্দ করে আমারই বন্দীশালা থেকে পালাতে সক্ষম হলো, আর তুই তাকে কৌশলে বন্দী করতে চাস? আমাকে তুই হাসালি চন্দনা! দস্যু বনহুর তোর সমীর বাবুর মত সরল–সহজ মানুষটা নয়। তাকে কৌশলে বন্দী করা যে কঠিন তার প্রমাণ তত আমরা পেয়েছি। তবে হ্যাঁ, আমি একবার দেখে নেবো দস্যু বনহুরকে...দাঁতে দাঁত পিষলল দস্যুরাণী।

চন্দনা বললো–জানি সে আমাদের সবাইকে বেশ জব্দ করেছে, আর সে কারণেই আমি শপথ করেছি তাকে বিড়ালছানার মত গলায় দড়ি দিয়ে,

বেশ বেশ, অনেক শুনলাম, এবার কাজে নেমে পড় চন্দনা। তারপর দেখবো কেমন শপথ রক্ষা করতে পেরেছি।

আচ্ছা, তুমি আমাকে তাহলে অনুমতি দাও রাণী?

অনুমতি দিলাম।

বেশ, দেখে নিও। চন্দনা দস্যুরাণীর চিবুক ধরে একটু নাড়া দিয়ে বললো–চললাম, দেখে নিও পারি কিনা!

বেরিয়ে যায় চন্দনা।

দস্যুরাণী শয্যায় দেহটা আবার এগিয়ে দেয়, তার মুখমন্ডলে ফুটে উঠে গভীর চিন্তারেখা। দস্যু বনহুর তার সঙ্গে বন্ধুত্বের অভিনয় করে তাকে ধোকা দিয়েছে, তার অনুচরদের করেছে আটক–কিছুতেই না, এরপর কিছুতেই ক্ষমা করা যায় না তাকে…তবে চন্দনা যা বললো মন্দ নয়, কৌশলে তাকে ফাঁদে ফেলতে হবে।

পরদিন।

দস্যুরাণী আর চন্দনা গোপনে কিছু আলাপ–আলোচনা করলো। তারপর তারা পুরুষের বেশে অশ্বপৃষ্ঠে রওনা দিলো কান্দাই শহর অভিমুখে।

দস্যুরাণী ও চন্দনা পুরুষ যুবকের বেশে রওনা দিলো কিন্তু তার অনুচরগণ রওনা দিলো কোনো দল দুঃস্থ ভিখারী বেশে, কোনো দল কৃষক বা মজুরের বেশে আর কোনো দল অন্ধ আর খোঁড়ার বেশে।

বিভিন্ন পথে এর একদিন এসে পৌঁছলো কান্দাই শহরে।

তার পূর্বেই অশ্বযোগে দস্যুরাণী আর চন্দনা পৌঁছে গেছে কান্দাই শহরে। তারা এক হোটেলে আশ্রয় নিয়েছে। চন্দনা পুরুষ ড্রেস পাল্টে স্বাভাবিক মেয়ের ড্রেসে সজ্জিত হয়েছে। ততক্ষণে আরও কয়েকজন অনুচর পৌঁছে গেছে এবং তারা মিলিত হয়েছে তাদের রাণীর সঙ্গে।

দস্যুরাণী এমনভাবে পুরুষের ড্রেসে সজ্জিত হলো তাকে দেখলে কেউ চিনতে পারবে না, এমনকি আপনজনও নয়। চন্দনা আর দস্যুরাণী শহরের সেরা কোনো এক জায়গায় নাচ–গানের আয়োজন করলো। সেখানে নাচ দেখাবে চন্দনা ও রাণী।

পথের ধারে দেয়ালে, লাইটপোষ্টে এবং শহরে বিভিন্ন জায়গায় পোষ্টার লাগানো হয়েছে। নাচের ভঙ্গিমায় চন্দনার অপূর্ব মনোমুগ্ধকর ছবি, সঙ্গে পুরুষবেশী দস্যুরাণী।

শহরে সাড়া পড়ে গেলো!

এমন নাচনেওয়ালী এর পূর্বে শহরে আসেনি কোনোদিন। পোষ্টারের ছবি দেখে কেউ বললো এরা ভাইবোন, কেউ বললো স্বামী–স্ত্রী আর কেউ বললো ওরা প্রেমিক–প্রেমিকা।

শহরের পথে–ঘাটে অলিতে গলিতে সব জায়গায় আলোচনা শুরু হলো এই নাচের। মোটে তিন দিন নাচ হবে কিন্তু তার পোষ্টার লাগানো হলো পনেরো দিন আগে থেকে।

শহরের সবেচেয়ে বড় হলে নাচ দেখানো হবে। প্রতিরাত এ শো চলবে। টিকেটের মূল্য উপরে একশ’ টাকা, নিচে পঁচিশ টাকা। শহরে এমন কোনো ব্যক্তি নেই, যে নাচ দেখার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলো না।

শো শুরু হবার তিন দিন আগে থেকে টিকেট দেওয়া শুরু হলো। একশ’ টাকা, পঞ্চাশ টাকা এবং পঁচিশ টাকা। হু হু করে টিকেট বিক্রি হচ্ছে।

কান্দাই শহরের ধনকুবের হতে সাধারণ লোক পর্যন্ত টিকেট কিনবার জন্য ভিড় জমিয়েছে হলের সম্মুখভাগে। লাইন তো লাইন, মারামারি হাতাহাতি শুরু হয়ে গেছে। শুধু এক হলেই নয়, শহরের বিভিন্ন স্থানে চলেছে টিকেট দেওয়া।

দস্যুরাণীর অনুচর যারা গরিব ভিখারী বেশে কান্দাই এসেছে তারাও লাইন ধরেছে, উদ্দেশ্য সবাইকে আকৃষ্ট করা। পেটে ভাত নেই, ছিন্ন ভিন্ন পরিধেয় বস্ত্র অথচ তারাও নাচ দেখার জন্য ভীষণ আগ্রহী।

দস্যুরাণীর অনুচরগণ কৌশলে কান্দাইবাসীদের মধ্যে প্রচার করলে এমন নাচ কোনোদিন তারা দেখেনি এবং দেখবেও না যদি এখন না দেখে। তাই সবাই উন্মুখ হয়ে উঠলো পেটে ভাত পড়ুক না পড়ুক নাচ তারা দেখবেই।

হু হু করে টিকেট বিক্রি হয়ে চলেছে।

লক্ষ লক্ষ টাকা সংগ্রহ হতে লাগলো। দস্যুরাণীর মুখে মৃদু হাসির আভাস ফুটে উঠলো।

টাকার স্তূপ যত বাড়ছে ততই দস্যুরাণী খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠছে। আর ক’দিন এভাবে টাকা সংগ্রহ হলে বিপুল পরিমাণ টাকা তার হাতের মুঠায় এসে যাবে।

দস্যুরাণী চন্দনার পিঠ চাপড়ে বললো–চন্দনা, তুই যা চেয়েছিলি তাই পেলি, তোর সাধনা জয়যুক্ত হবে।

সত্যি বলছো রাণী?

হাঁ, আমার তাই মনে হচ্ছে।

*

বনহুর মনিরাকে তার শহরে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এলো পুলিশ বাহিনীর অগোচেরে নিজ আস্তানায়। সুড়ঙ্গপথে সে চৌধুরীবাড়ির বাগানবাড়ি পর্যন্ত পৌঁছলো। বনহুরের অনুচরগণ দীর্ঘদিন ধরে এই সুড়ঙ্গপথ খনন করে গুপ্ত পথ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। আর কিছুদিন খনন কাজ চালালেই সুড়ঙ্গপথ একেবারে চৌধুরীবাড়ি পর্যন্ত হয়ে যাবে।

কেউ জানবে না বুঝতে পারবে না, কেউ পাবে না এই সুড়ঙ্গপথের সন্ধান। মনিরার সেকি আনন্দ, তার স্বামীকে সে নিয়মিত কাছে পাবে তখন।

নতুন সুড়ঙ্গপথ মনিরার হৃদয়ে জাগায় নতুন আনন্দোচ্ছাস।

অবাক হয়ে দেখে সে, যত দেখে ততই বিস্মিত হয়। কদিন নূরীর সঙ্গে স্বামীর গোটা আস্তানা ঘুরেফিরে দেখে তার মনে জেগেছে বিরাট এক চেতনা। সত্যিই তার স্বামী বিশ্ববিজয়ী দস্যুসম্রাট–যার শুধু শক্তিই নয়, বুদ্ধিমত্তাও অপরিসীম– মনিরা সম্বিৎহারা হয়ে পড়ছিলো যেন।

নতুন সুড়ঙ্গপথে এগুতে গিয়ে নতুন অভিজ্ঞতা হলো মনিরার। বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলো সে, যখন একটা অদ্ভুত যানে তাকে তুলে নিয়ে মাত্র কয়েক মিনিটে পৌঁছে গেলো বনহুর শহরের সন্নিকটে চৌধুরীবাড়ির বাগানবাড়ি পর্যন্ত। তারপর অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে পৌঁছে গেলো তারা চৌধুরীবাড়িতে।

বনহুর নিরিবিলি মায়ের সঙ্গে দেখা করেছিলো, মায়ের বুকে মাথা রেখেছিলো শান্তির আবেশে।

মরিয়ম বেগম পুত্রকে নিবিড় করে কাছে পেয়ে খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠেছিলেন, মাথায় হাত বুলিয়ে প্রাণভরে দোয়া করেছিলেন।

বনহুর হৃষ্টচিত্তে ফিরে এসেছে আস্তানায়। আজ তার মনে অফুরন্ত আনন্দ। বিশেষ করে মায়ের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটেছে, মায়ের দোয়া পেয়েছে সে।

বনহুর বিশ্রামকক্ষে বসেছিলো, দীপ্ত উজ্জ্বল তার মুখমন্ডল।

এমন সময় রহমান এসে উপস্থিত হলো।

বনহুর প্রশ্নভরা চোখ তুলে ধরলো–কি সংবাদ রহমান?

সর্দার, একটা দুঃসংবাদ।

দুঃসংবাদ।

হা সর্দার।

বলো কি সংবাদ

কান্দাই শহরে বিদেশ থেকে এক নর্তকী এসেছে। তার সঙ্গে এসেছে এক তরুণ। তারা উভয়ে নিউ থিয়েটার হলে নাচ দেখাবে। মাত্র তিনদিন তারা ঐ হলে নাচবে, তার জন্য দু'সপ্তাহ আগে থেকেই টিকেট বিক্রি করছে। লাখো লাখো লোক স্রোতধারার মত এই টিকেট সংগ্রহ করছে।

বনহুর মৃদু হেসে বললো–এটা তো সুসংবাদ।

সর্দার, কান্দাই শহরে এমন কোনো ব্যক্তি নেই যে ঐ টিকেট ক্রয় থেকে বিরত আছে। এমনি গরিব ও অসহায়–যারা সমস্ত দিন মজুর খেটে পয়সা সংগ্রহ করে, তারাও নিজেদের কষ্টের শ্রমের পয়সা দিয়ে টিকেট সংগ্রহ করে নিচ্ছে।

বললো বনহুর–সখ সবারই আছে, কাজেই এটা দুঃসংবাদ কে বললো?

সর্দার, এভাবে দেশের অর্থ যদি নিঃশেষ হয়ে বিদেশে চলে যায় তাহলে দেশে এক মহা সমস্যা দেখা দেবে, তাতে কোনো ভুল নেই। গরিব অসহায় বেচারাগণ–তারাও উন্মাদ হয়ে উঠেছে নাচ দেখার জন্য এবং তারা কষ্টে উপার্জিত অর্থ বিনষ্ট করে চলেছে দিকবিদিক খেয়াল না করে।

বনহুর একটা শব্দ উচ্চারণ করলো–হু!

রহমান বললো–এভাবে দেশের অর্থ পোষণ করে নিয়ে যাবে আর...

যাও রহমান, আমাদের জন্য দুটো টিকেট নিয়ে এসো।

সর্দার।

হ্যাঁ, আমি যাব এবং সঙ্গে থাকবে তুমি।

সর্দার!

হ্যাঁ, প্রথম শোর টিকেট নেবে, আমি প্রথম রাতেই যেতে চাই।

আচ্ছা সর্দার।

রহমান মাথা নত করে বেরিয়ে আসে সর্দারের বিশ্রামকক্ষ থেকে।

অদূরে দাঁড়িয়ে ছিল নাসরিন এবং নূরী।

মনিরাকে পৌঁছে দিয়ে আসার পর বনহুর যে আরও বেশি গম্ভীর হয়ে পড়েছে। এমনিতেই বনহুর কথা বলে কম, সব সময় গম্ভীরভাবে চিন্তা করে সে। কি ভাবে সেই জানে সেই বোঝে, তবে চিন্তা ভাবনা যে তার দেশ আর দেশবাসীর মঙ্গল নিয়ে তা জানে নূরী।

তবু কেন যেন সঙ্কোচ লাগে নূরীর, মনিরা আশা ছিলো কদিন বেশ কেটেছে। মনিরা আপা চলে গেছে বড় অস্বস্তি লাগছে তার কাছে। তার হুরও যেন কেমন আনমনা হয়ে পড়েছে।

নূরী আর নাসরিন মনিরাকে নিয়েই আলোচনা করছিলো, এমন সময় রহমানকে হন্তদন্ত হয়ে সর্দারের বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করতে দেখে ওরা অবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিলো, যদিও তাদের মনে নানা প্রশ্ন জাগছিলো তবু ওরা ওৎ পাতেনি আড়াল থেকে।

যতক্ষণ রহমান সর্দারের বিশ্রামকক্ষে ছিলো ততক্ষণ নাসরিন আর নূরী দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করছিলো ব্যাপার কি জানবার জন্য।

রহমান বেরিয়ে আসতেই পথ আগলে দাঁড়ালো নূরী আর নাসরিন, বললো নূরী–কি সংবাদ সর্দারকে জানাবে রহমান?

সংবাদ গুরুতর!

বল কি!

হাঁ।

সর্দার কি বললো?

আশ্চর্য উক্তি নয়–অত্যন্ত সহজ কথা।

খুলেই বলোনা সংবাদটা শুনি?

কোনো ফল হবে না।

তবু বলোই না?

শোন, শহরে বিদেশী এক নর্তকী এসেছে, সঙ্গে এত তরুণ। দু'জন কান্দাই শহরের নিউ থিয়েটার হলে নাচ দেখাবে। টিকেটের মূল্য একশ টাকা হতে নিচে পঁচিশ টাকা পর্যন্ত। অথচ টিকেট সংগ্রহের বিরাম নেই। কি যে যাদু আছে ঐ পোষ্টারে যার জন্য কান্দাইয়ের জনগণ পঙ্গপালের মত ছুটেছে শোর টিকেট কিনতে। রাজপথ লোকে লোকারণ্য।

এ আবার কি এমন সংবাদ রহমান? বললো নূরী।

রহমান বললো–সবাই উন্মাদ হয়ে উঠেছে। যারা সমস্ত দিন কলকারখানায় পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করে, তারাও বৌ–সন্তানদের অভুক্ত রেখে নিয়ে শো দেখার জন্য টিকেট সংগ্রহ করে চলেছে। নূরী, আমার মনে হয় এরা সাধারণ কোনো নাচনেওয়ালী নয়, এদের কোনো উদ্দেশ্য আছে এবং সেই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যই...

হাঁ রহমান, ঠিক বলেছো। উদ্দেশ্য ছাড়া কেউ কোনো কাজ করে না।

চমকে ফিরে তাকায় রহমান, নূরী এবং নাসরীন।

দেখলো বনহুর তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে এবং কথাগুলো সেই বললো

*

শো শেষ হলো।

চন্দনা আর দস্যুরাণী তাদের বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করলো। দস্যুরাণীর দেহে পুরুষের ড্রেস, তারা মঞ্চে একসঙ্গে নেচেছে–অদ্ভুত সে নাচ।

মঞ্চ থেকে বেরিয়ে আসতেই অগণিত দর্শক তাদের উভয়কে নানারকম উপঢৌকন এবং পুষ্পমাল্য অর্পণ করেছিলো।

ওরা বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করতেই দস্যুরাণীর অনুচরগণ উপঢৌকন দ্রব্য এবং পুষ্পমাল্যের স্তূপ এনে তাদের সম্মুখে রাখলো।

আজ তাদের প্রথম দিন।

দর্শকমহল অভিভুত হয়ে পড়েছেনাচ চলাকালে করতালিতে মুখর হয়ে উঠেছিলো রঙ্গমঞ্চ। বাহবার অন্ত ছিলো না। দস্যুরাণীর খুশির অন্ত নেই। যা সে চেয়েছিলো তাই পেয়েছে। চন্দনাকে দস্যুরাণী ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছে না।

বিশ্রামকক্ষে পৌঁছানোর পর অনুচরগণ যখন তাদের উপহার সামগ্রী এবং পুষ্পমাল্যের স্তূপ নিয়ে টেবিলে রেখে পিছু হটে বেরিয়ে এলো, তখন দস্যুরাণীর মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠলো।

চন্দনার দেহে তখনও নর্তকীর পোশাক।

দু'পাশে দু'গোছা লম্বা বিনুনী ঝুলছে। কিছুটা চুল চুড়া করে মাথার উপর অংশে বাধা। ললাটে টিকলির মাঝে উজ্জ্বল হীরকখন্ড ঝুলছে।

নকল হীরকখন্ড নয়, আসল হীরক।

গলায় মুক্তার মালা।

এক ছড়া নয়, কয়েক ছড়া রয়েছে। চন্দনার দু'কানে দুটি নীলা পাথরের দুলা দুল দু'টি থেকে নীলাভ আলোর ছটা বেরিয়ে আসছে।

ঘাগড়া আর ওড়নায় সোনালী জরির বুটি।

ইলেকট্রিক আলোতে ঝলমল করছে চন্দনার ঘাগড়া আর ওড়নার বুটিগুলো। সমস্ত দেহের অলঙ্কার থেকে আলোকরশ্মি বিচ্ছুরত হচ্ছে।

অপূর্ব লাগছে চন্দনাকে।

দস্যুরাণী মৃদু হেসে বলে–সত্যি চন্দনা, তুই অদ্ভুত নেচেছিস?

তোমার নাচটাও কিন্তু মন্দ হয়নি। যদি মিঃ আহাদ চৌধুরী একবার দেখতেন তাহলে নিশ্চয়ই তিনি অভিভূত হয়ে পড়তেন।

দস্যুরাণীর মুখমন্ডল গম্ভীর হলো।

চন্দনা বললো–হঠাৎ কি হলো রাণী?

কিছু না।

সত্যি করে বলতে তোমার মনে আহাদ চৌধুরীর কথা উদয় হয়নি?

হা হয়েছে, আর সেটা তুইই স্মরণ করিয়ে দিয়েছিস।

রাণী!

যাক ও সব, এখন কাজের কথা শোন চন্দনা। প্রচুর অর্থ আর উপঢৌকন আসছে সত্য কিন্তু আসল উদ্দেশ্য সফল হবে কিনা সন্দেহ।

চন্দনা মাথা থেকে ওড়নার ক্লিপ খুলতে খুলতে বললো–নিশ্চয়ই দস্যসম্রাটের কানে এ নাচের কথা পৌঁছেছে। এত অর্থ আর সম্পদ দেশ থেকে কেউ নিয়ে যাবে, এটা আর কেউ সহ্য করলেও দস্যু বনহুর করবে না, কাজেই……

কথা শেষ হয় না চন্দনার, একখানা সূতীক্ষ্ণ ধার ছোরা এসে গেঁথে যায় দস্যুরাণীর সম্মুখের টেবিলে।

দস্যুরাণী এবং চন্দনা চমকে উঠলো।

বুঝতে পারলো দস্যুসম্রাট পৌঁছে গেছে।

দস্যুরাণী এগুলো টেবিলখানার দিকে।

টেবিলে স্তূপাকার উপঢৌকনের মাঝখানে ছোরাখানা চক্ করছে। দস্যুরাণী একটানে ছোরাখানা তুলে নিলো। ছোরার বাটখানা সোনার তৈরি এবং তাতে রয়েছে অদ্ভুত ধরনের ক্রসচিহ্ন। দস্যুরাণী ছোরাটা তুলে নিতেই দেখলো এক টুকরা কাগজ তাতে গাঁথা রয়েছে।

চন্দনাও উঠে এসে দাঁড়িয়েছিলো তার পাশে। বললো–সে–কাগজখানায় কি লেখা আছে দেখো দেখি রাণী?

দস্যুরাণী ততক্ষণে ছোরা থেকে কাগজের টুকরাটা খুলে নিয়ে মেলে ধরলো চোখের সামনে, তাতে লেখা আছে–

রাণীজী, সহচরীর সঙ্গে চমৎকার নেচেছো, অভিনন্দন গ্রহণ করো। কিন্তু যে উদ্দেশ্য নিয়ে কাজে নেমেছে সেই উদ্দেশ্য সফল হবে না–কান্দাই থেকে বিদায়। নেবার সময় একটা কানাকড়িও সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে না।

—দস্যু বনহুর

দস্যুরাণীর মুখমন্ডল গম্ভীর থমথমে হয়ে উঠলো, সে কাগজের টুকরাখানা এগিয়ে দিলো চন্দনার দিকে, বললো–পড়ে দেখ।

চন্দনা দ্রুত কাগজের টুকরাখানার উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিলো একবার দুবার তিনবার, তারপর সে বললো–রাণী, দস্যু বনহুরের তাহলে আগমন ঘটেছে। সে আমাদের নাচের আসরে উপস্থিত ছিলো…

হাঁ, ছিলো।

তাহলে তুমি জানতে?

জানলে বনহুরের সাধ্য ছিলো না সে নীরবে বেরিয়ে যায় হল থেকে। হাঁ, আমিও দেখে নেবো তাকে কেমন করে সে আমাকে বাধা দেয়। এ অর্থ আর উপঢৌকন সব আমার সঙ্গে যাবে।

কিন্তু দস্যু বনহুর যে সব জেনে ফেলেছে রাণী? আমরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে কান্দাই এসেছি তা সফল হলো না। শেষ কথাগুলো চন্দনার হতাশায় ভরা।

দস্যুরাণী দাঁতে দাঁত পিষে বললো–যেমন করে তোক প্রতিশোধ আমি নেবোই। দস্যু বনহুরকে আমি যেমন করে পারি শায়েস্তা করবই। নারী বলে সে আমাকে হেয় মনে করে……

মোটেই না, তুমি রাণী, আমি তোমার বন্ধু….

চমকে ফিরে তাকায় দস্যুরাণী এবং চন্দনা। দেখে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে দস্যু বনহুর।

সঙ্গে সঙ্গে মুখমন্ডল কঠিন হয়ে উঠে তাদের। দস্যুরাণীর চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বের হতে থাকে। চন্দনাও ক্রুদ্ধ হয়, কুঞ্চিত করে তাকায় সে বনহুরের দিকে।

বনহুর দীপ্ত বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে এসে দাঁড়ায় মেঝের কার্পেটের মাঝামাঝি। সম্মুখে টেবিল এবং দুটি চেয়ার পাশাপাশি রয়েছে। বনহুর বুট সহ একখানা পা চেয়ারে তুলে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। মৃদু হেসে বলে–সুন্দর কৌশল এঁটেছে রাণীজী। কিন্তু জানো এর পরিণতি কি?

দস্যুরাণী বললো বন্ধুত্বের পরিচয় দিয়ে নিজকে বাঁচিয়ে আসলে আর আমার অনুচরদের কৌশলে করেছো বন্দী–জানো আমি তোমাকে এজন্য উপযুক্ত শাস্তি দেবে?

জানি আর সে কারণেই শশরীরে তোমার সম্মুখে হাজির হয়েছি। রাণীজী, আমাকে শাস্তি দাও, তা বলে আমার দেশবাসীর এমনভাবে সর্বনাশ করো না।

সর্বনাশ! কিসের সর্বনাশ? তোমার দেশবাসী তো খুশি হয়ে আমাকে এসব উপঢৌকন দিচ্ছে।

কিন্তু তাদের তুমি বাধ্য করেছে!

না, তারা স্বেচ্ছায় এ অথ্য আর উপঢৌকন দিয়েছে বা দিচ্ছে। শোন বনহুর, শুধু অর্থ আর উপঢৌকন নিয়ে আমি খুশি হবে না। যতক্ষণ না তোমাকে বন্দী করে

নিয়ে যাবো যতক্ষণ…

হাঃ হাঃ হাঃ বন্দী করে নিয়ে যাবে আমাকে? রাণীজী, তোমার সখ মন্দ নয় দেখছি কিন্তু মনে রেখো, তুমি যা সংগ্রহ করছে বা করেছে তার এককণাও তুমি নিয়ে যেতে পারবে না হাঁ, আরও এক কথা তুমি শুনে রাখো রাণীজী, ইচ্ছা থাকলেও আমি তোমাকে আটক করছি না, কারণ তুমি রাণী। দুর্বল জাতির উপর আমি কোনোদিন কঠিন হতে পারি না। যাক ওসব কথা, তুমি দলবল নিয়ে চলে যাও……কথাটা স্মরণ রেখো রাণীজী।

বেরিয়ে গেলো বনহুর যেমন আলগোছে এসেছিলো তেমনি ভাবে।

দস্যুরাণী ক্রুদ্ধ সিংহীর ন্যায় ফুলতে লাগলো।

চন্দনার চোখমুখেও ক্রুদ্ধভাব ফুটে উঠেছে।

দস্যুরাণী দাঁতে দাঁত পিষে বললো–দুর্বল। নারী জাতি দুর্বল? আমি শপথ করলাম, বনহুরকে আমি শায়েস্তা করবোই।

পরদিন শো শুরু হলো।

নাচের মঞ্চ থেকে দস্যুরাণীর দৃষ্টি ঘুরে ফিরতে লাগলো দর্শকদের মুখে মুখে। দস্যুরাণী জানে বনহুর আজও এসেছে এবং সে দর্শকদের মাঝেই আত্নগোপন করে আছে কিন্তু কোথায় আছে!

নাচ চলেছে।

নাচের তালে তালে যখন দস্যুরাণী আর চন্দনা এক জায়গায় এসে পড়লো, তখন চন্দনা দস্যুরাণীর কানে মুখ নিয়ে বললো–রাণী, দস্যু বনহুর কিন্তু এই আসরেই আছে….

দস্যুরাণী বললো–জানি এবং আমার চোখ দুটো তাকেই সন্ধান করে ফিরছে।

আমিও তাকে খুঁজছি…

নাচের তালে তালে আবার ও সরে পড়লো উভয়ে উভয়ের কাছ থেকে দূরে মঞ্চের এপাশ আর ওপাশে।

একপাশে বাদ্যযন্ত্রীরা বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে চলেছে।

বাজনার সুর আর অদ্ভুত মৃত্যু কান্দাইবাসীদের মনে অপূর্ব শিহরণ জাগিয়েছে। তারা মুগ্ধ, বিহ্বল হয়ে পড়েছে।

আজকের শো হিরাঝিল রাজকন্যা।

কাহিনী ঐতিহাসিক।

রাজকন্যার জীবন কাহিনী।

রাজকুমারের বেশে দস্যুরাণী আর রাজকুমারীর বেশে চন্দনা!

অপূর্ব জুটি।

রাজকুমারীর হরণ–দৃশ্যে এক কাপালিক এসে তাকে চুরি করে নিয়ে যাবে। মাথায় জটাজুট আর মুখে একমুখ কাঁচা–পাকা দাড়ি। ভয়ঙ্কর চেহারা এবং ভীষণ শক্তিশালী।

কাপালিক রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলো।

মঞ্চ আধো অন্ধকার।

দর্শকমহল রুদ্ধ নিঃশ্বাসে মঞ্চের দিকে তাকিয়ে আছে।

ঘন্টাধ্বনি হচ্ছে!

কেমন যেন একা ভয়াবহ থমথমে বিরাজ করছে।

ভীষণ চেহারার কাপালিক চুপি চুপি এগিয়ে আসছে। এখন বাদ্যযন্ত্রীরা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বাদ্য বাজিয়ে চলেছে। মঞ্চ পরিস্কার। রাজকুমারী বসে আছে বৃক্ষতলে, সম্মুখে নদী কুল কুল রবে বয়ে যাচ্ছে।

কাপালিক আধো অন্ধকারে এগিয়ে আসছে।

রাজকন্যা রাজকুমারের প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছে, ঠিক ঐ সময় কাপালিক রাজকন্যাবেশী চন্দনাকে তুলে নিলো কাঁধে।

দর্শকমহলের চোখেমুখে বিস্ময় তারা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দেখছে।

রাজকুমারীর হাত-পা ছুড়ছে।

কাপালিক আলগোছে রাজকুমারীবেশী চন্দনাকে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেলো মঞ্চ থেকে।

মঞ্চের বাইরে এসে তাকে নিয়ে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে যাচ্ছিলো কাপালিক। রাজকুমারী তখন হাত-পাব ছুড়ছে আর চিৎকার করছে বাঁচাও বাঁচাও।

সিঁড়ির মুখে পথ আগলে দাঁড়ালো দস্যুরাণী রাজকুমারের বেশে, হাতে তার রিভলভার, বললো খবরদার, এক পা এগিয়েছো কি মরেছো। ওকে নিচে নামিয়ে দাও বনহুর।

কিন্তু ঐ মুহূর্তে হঠাৎ কে যেন আঘাত করলো পিছন থেকে রাজকুমারবেশী দস্যুরাণীর হাতে, সঙ্গে সঙ্গে তার হাত থেকে রিভলভারখানা ছিটকে পড়লো সিঁড়ির নিচের ধাপে।

ঐ মুহূর্তে বলিষ্ঠকায় পুরুষ সেই কাপালিক রাজকুমারবেশী চন্দনাকে নিয়ে এত সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলো নিচে এবং অদূরে থেমে থাকা একটা গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলো।

গাড়ির পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলো দুজন লোক, তারা গাড়ির দরজা খুলে ধরলো।

কাপালিক চন্দনাকে গাড়ির পিছন আসনে তুলে সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভ আসনে উঠে বসলো।

যারা গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে ছিলো, তারাও ক্ষিপ্রগতিতে উঠে বসলো গাড়ির পিছন সিটে। গাড়ি ছুটতে শুরু করলো।

মাত্র কয়েক মিনিট।

অদূরে দন্ডায়মান তার একটা গাড়িতে চেপে বসলো দস্যুরাণী। সে তার সহকারী দু'জন অনুচরকে বললো–এসো তোমরা আমার সঙ্গে। দস্যু বনহুর চন্দনাকে নিয়ে উদাও হওয়ার চেষ্টা করছে। এসো তোমরা।

অনুচরদ্বয় গাড়িতে উঠে বসতেই দস্যুরাণী দাড়িতে স্টার্ট দিলো। গাড়ি উল্কাবেগে ছুটতে শুরু করলো।

সামনের গাড়িখানা ততক্ষণে অনেকদূর এগিয়ে গেছে দস্যুরাণীর গাড়ি অনুসরণ করছে সেই গাড়িখানাকে।

সামনের গাড়িখানা চালাচ্ছে সেই অদ্ভুত লোকটা যে চন্দনাকে কাঁধে নিয়ে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে বাড়িতে চেপে বসেছিলো চন্দনাকে সে বলিষ্ঠ হাতে ধরে ছিলো যাতে সে গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়তে না পারে।

রাত্রির নির্জন রাজপথ।

তেমন যানবাহন চলছে না রাজপথে।

গাড়ি দুটো তীরবেগে ছুটছে।

ঐ গাড়ি দুটো এগুতেই আরও একখানা গাড়ি ছুটলো সামনের দাঁড়ি দু'খানার অলক্ষ্যে।

এ গাড়িখানা কার কেউ জানে না।

গাড়িখানা অপেক্ষা করছিলো শহরের অদূরে নির্জন এক স্থানে। গাড়ির চালক কে তাও কেউ জানে না, কেউ লক্ষ্যও করেনি তাকে। কিন্তু চালক সবকিছু লক্ষ্য করছিলো। সে বেশি কিছু দূরে অপেক্ষা করছিলো আত্মগোপন করে।

সামনের গাড়ি থেকে মাঝে মাঝে ক্ষীণ আর্তচিৎকার শোনা যাচ্ছিলো। ইতিমধ্যে যদিও পিছন সিটের লোক দুজন চন্দনার হাত দুখানা পিছমোড়া করে বেধে ফেলেছিলো কিন্তু মুখ তার ভোলাই ছিলো এবং মুখ খোলা থাকার জন্যই চন্দনা আর্তচিৎকার করতে সক্ষম হচ্ছিলো।

পথে যানবাহন তেমন ছিলোনা, তাই কেউ চন্দনার চিৎকার শুনতে পেলো না।

রাশিকৃত ধূলো ছড়িয়ে দিয়ে গাড়িখানা ছুটছে।

দস্যুরাণী দাতে অধর কামড়ে ধরে গাড়ি চালাচ্ছে। তার পাশে এবং পিছনে অনুচরগণ অস্ত্র হাতে প্রস্তুত হয়ে প্রতীক্ষা করছে সামনের গাড়িখানা লক্ষ্যের ভিতরে এলেই তারা গুলী ছুড়বে। দস্যুরাণী প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আজ সে দস্যু বনহুরকে দেখিয়ে দেবে মজাটা।

সামনের গাড়ির চালক অত্যন্ত দক্ষ, এমন নিপুণভাবে সে গাড়ি চালিয়ে চলেছে যে, লাইটপোষ্টগুলো পার হতে তার মাত্র কয়েক সেকেন্ড লাগছিলো।

সামনে গাড়িখানাকে অনুসরণ করছে দুটি গাড়ি।

একটা দস্যুরাণী স্বয়ং ড্রাইভ করছে।

অপরটাতে কে তা কেউ জানে না।

শহরের রাজপথ পেরিয়ে সোজা গাড়িখানা কান্দাই ব্রীজের দিকে এগিয়ে চললো।

নিচে গভীর নদী এবং ভীষণ জলোচ্ছাস।

আর উপরে প্রশস্ত ব্রীজ।

রাত গম্ভীর হওয়ায় ব্রীজের উপর কোনো যানবাহন বা লোক চলাচল নেই।

সম্পূর্ণ নির্জন!

দস্যুরাণীর লক্ষ্য যে সামনের গাড়িখানা–তা সেই গাড়ির আরোহী বুঝতে পেরেছে এবং সে কারণেই গাড়ির স্পীড ক্রমে ক্রমে বাড়িয়ে ফুলস্পীডে এনেছে।

সামনের গাড়িটা এত দ্রুত ছুটে চলেছে সে যে কোনো মুহূর্তে গতিভ্রষ্ট হতে পারে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। গাড়ি গতিভ্রষ্ট হলে শুধু গাড়িখানাই ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হবে না, গাড়ির অভ্যন্তরের সব আরোহী যে মৃত্যুবরণ করবে তাতেও কোনো সন্দেহ বা ভুল নেই।

দস্যুরাণীও ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, যেমন করে হোক গাড়িখানাকে সে পাকড়াও করবেই এবং দেখে নেবে দস্যু বনহুরকে।

সর্বশেষ গাড়িখানা কার তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, তবে ঐ গাড়ির চালকও যে কম নয়, তার গাড়ি চালনায়ই বোঝা যাচ্ছে।

ব্রীজের মাঝামাঝি গাড়িখানা এসে গেছে।

যেভাবে সামনের গাড়িখানা ছুটছে তাতে কয়েক মিনিটের মধ্যেই গাড়িখানা ব্রীজের ওপারে চলে যাবে। ওপারে একটি নয়, পাঁচটা পথ, যে কোনো পথের বাকে গাড়িটা উধাও হতে পারে। তখন কিছুতেই গাড়িখানাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ব্রীজের মুখেই পাঁচটা পথের সংযোজন রয়েছে।

দুটি চলে গেছে পর্বত অভিমুখে আর দুটি শহরের দিকে। আর একটা পল্লী বা গ্রামাঞ্চলের দিকে।

শহর অভিমুখে যে পথ দু'টি চলে গেছে সে দুটি পথ সুন্দর মনোরম এবং দুপাশে নানা রকম সৌখিন গাছপালা রয়েছে। দু'পাশে লাইটপোষ্টের সারি নীরব প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে। কিছুদূর এগুতেই দু'পাশে সুন্দর সুন্দর নয়নমুগ্ধকার দালানকোঠা, দোকানপাট রয়েছে।

ব্রীজের পারে তেমন বিশেষ লোকবসতি নেই। দিনের বেলায় যানবাহনের ভীড় থাকে, রাতে তেমন ভীড় থাকে না, তাই নীরব মনে হয়।

আর দু'টি পথ কান্দাই পর্বত অভিমুখে চলে গেছে। একটি পথ পর্বতের কোল বেয়ে চলে গেছে আর অপরটি চলে গেছে পর্বতমালার বুক চিরে ঠিক ঘন চুলের সিথির মত সোজাসুজিভাবে।

দু'পাশে খাড়া পর্বতমালা।

মাঝে খাদের মত পথ।

এ পথটা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর।

তাই সহসা এ পথে কেউ আসে না।

পথে চলতে গেলে আকাশ দৃষ্টিগোচর হয় না, হঠাৎ কোনো কোনো স্থানে যদিও কিঞ্চিৎ আকাশ নজরে পড়ে, তাও স্পষ্ট নয়।

দস্যুরাণীর সন্দেহ হলো বনহুর চন্দনাকে নিয়ে ঐ পথে পর্বত মালার অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে এবং করলে তাকে পাকড়াও করা তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হবে না। তাই দস্যুরাণী প্রাণপণে গাড়িখানাকে পাকড়াও করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু পিছনের গাড়িখানা কার এবং কি উদ্দেশ্য নিয়ে আসছে।

যদিও দস্যুরাণীর দৃষ্টি ছিলো সামনের গাড়িখানার উপর তবু সে পিছনের গাড়িখানার প্রতি লক্ষ রেখে চলেছিলো, পিছন গাড়িখানা যে তাদের গাড়ি দু'খানাকে অনুসরণ করছে তা ঠিক বুঝতে পেরেছে দস্যুরাণী।

কিন্তু ঐ গাড়িখানাকে নিয়ে ভাববার তার সময় নেই এখন। যেমন করে হোক উদ্ধার করতে হবে চন্দনাকে।

দস্যুরাণী অবাক হলো।

পিছনের গাড়িখানা চোখের নিমিষে এগিয়ে এলো এবং তার গাড়িখানাকে পিছনে ফেলে দ্রুত এগিয়ে গেলো ব্রীজের সামনের দিকে।

দস্যুরাণী মুহূর্তের জন্য হতভম্ব হয়ে পড়লো।

ততক্ষণে পিছনের গাড়িখানা উল্কাবেগে সামনের গাড়িখানাকে ধাওয়া করলো এবং ব্রীজের মুখে এসে গাড়িখানার পথ রোধ করে দাঁড়ালো।

এবার সামনের গাড়িখানা থেমে পড়লো ব্রেক কষে। সঙ্গে সঙ্গে পিছন গাড়ির চালক এবং তার তিনজন সঙ্গী ক্ষিপ্রগতিতে নেমে পড়লো গাড়ি থেকে।

সামনের গাড়িখানা থেমে পড়েছে বটে কিন্তু কেউ আসন ত্যাগ করেনি। চন্দনার গলার ক্ষিণ আওয়াজ ভেসে এলো গাড়িখানার ভিতর থেকে।

দু'জন বলিষ্ঠ লোক চন্দনাকে জোরপূর্বক ধরে এনেছে। আর সামনের আসনে বসে গাড়ি চালাচ্ছে সেই বলিষ্ঠ ভীষণ চেহারার লোকটা, যে চন্দনাকে হরণ করে

নিয়ে পালাতে সক্ষম হয়েছে।

সামনের আসন থেকে লোকটা কঠিন কণ্ঠে বললো–কে তোমরা নিশ্চয়ই দস্যুরাণীর অনুচর

কিন্তু লোকটার কথা শেষ হয় না, পিছন গাড়ির চালক নেমে এসে এক হেচকা টানে ওকে ড্রাইভ আসন থেকে নামিয়ে নিলো, সঙ্গে সঙ্গে প্রচন্ড এক ঘুষি বসিয়ে দিলো তার নাকের উপর।

লোকটা হুমড়ি খেয়ে পড়লো।

যারা পিছন আসনে চন্দনাকে ধরে বসেছিলো, তারা চন্দনার মুখে রুমাল গুঁজে দিলো।

পর পর নাকে মুখে ঘুষি চাপিয়ে পিছন গাড়ির চালক প্রথম গাড়ির চালকের অবস্থা কাহিল করে ফেললো অল্পক্ষণের মধ্যেই।

ততক্ষণে দস্যুরাণীর গাড়িও এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

দস্যুরাণী গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে এ দৃশ্য লক্ষ্য করলো এবং অবাক হলো। রাত্রির অন্ধকারে স্পষ্ট না বোঝা গেলেও নজরে পড়লো যারা ওখানে লড়াই করছে তারা উভয়েই বিশালদেহী এবং শক্তিশালী।

দস্যুরাণী নেমে দাঁড়াতেই তার অনুচরগণ নেমে পড়লো গাড়ি থেকে এবং তারা চন্দনাকে উদ্ধারের জন্য পা বাড়াতেই দস্যুরাণী বাম হাতখানা প্রসারিত করে ক্ষান্ত হতে বললো।

দস্যুরাণীর নির্দেশমত অনুচরগণ থেমে পড়লো। তারাও অবাক চোখে দেখছে কে ঐ ব্যক্তি যে চন্দনার হরণকারীদের সায়েস্তা করতে বদ্ধপরিকর।

বেশিক্ষণ লাগলো না, পিছন গাড়ির চালক বলিষ্ঠ লোকটাকে আঘাতের পর আঘাত করে কাবু করে ফেললো এবং তাকে চেপে ধরে ব্রীজের উপর থেকে ঠেলে ফেলে দিলো উচ্ছ্বসিত জলতরঙ্গের মধ্যে। তারপর গাড়িখানার দিকে এগুলো সে।

কিন্তু ঐ মুহূর্তে চন্দনাকে ছেড়ে দিয়ে অপর লোক দু'জন গাড়ি থেকে নেমে দিলো ভৌ দৌড়।

পিছন গাড়ির চালক ক্ষিপ্রহস্তে গাড়ির দরজা খুলে চন্দনাকে বের করে আনলো, তারপর তাকে ঠেলে দিলো দস্যুরাণী যেদিকে দাঁড়িয়েছিলো সেইদিকে।

চন্দনা পড়তে পড়তে বেঁচে গেলো।

টাল সামলাতে গিয়ে জাপটে ধরলো সে দস্যুরাণীকে।

দস্যুরাণীর দৃষ্টি তখন তীক্ষ্ণভাবে বলিষ্ঠ লোকটাকে লক্ষ্য করছিলো। কে এই ব্যক্তি যে দস্যু বনহুরকে কাহিল করতে পারে।

কিন্তু দস্যুরাণী চিন্তধারার কোনো সমাধান হলো না, লোকটা আলো অন্ধকারে নিজের গাড়ির দিকে দ্রুত এগিয়ে গেলো।

দস্যুরাণী বা চন্দনা কিংবা দস্যুরাণীর অনুচরগণ কেউ তাকে স্পষ্ট দেখতে পেলো না, যেমন দেখতে পায়নি তারা প্রথম গাড়ির চালককে।

দস্যুরাণী ইচ্ছা করলে এগুতে পারতো কিন্তু সে সুযোগ সে নিলো না।

গাড়িখানা যে পথে এসেছিলো ব্যাক করে সেইদিকে ফিরিয়ে নিলো গাড়ির মুখখানা, তারপর হাওয়ার বেগে উধাও হলো।

দস্যুরাণীর দৃষ্টি এড়ালো না, গাড়িখানা যখন ব্যাক করে পিছনে হটছিলো তখন গাড়ির নাম্বারটা লক্ষ্য করে দেখে নিলো দস্যুরাণী।

ওদিকে যে দু'জন লোক চন্দনাকে ছেড়ে দিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছিলো তারা উধাও হয়েছে।

দস্যুরাণী তাকিয়ে দেখলো আশে পাশে কোনোর মানুষের ছায়া পর্যন্ত নেই। কোনো যানবাহনও চলছে না। ব্রীজ সম্পূর্ণ ফাঁকা। দস্যু বনহুর হয়তো এতোক্ষণে কান্দাই নদীবক্ষে এতদূর এসেছিলো, নাহলে তাকে বেশ পেরেশান হতে হতো। দস্যুরাণী অপর গাড়িখানার নাম্বারটাও মনে গেঁথে নিলো। সে দেখবে কারা এরা।

চন্দনার মুখে হাসি ফুটেছে।

এতক্ষণ সে ভাবতেও পারেনি দস্যু বনহুরের কবল থেকে এত সহজে সে মুক্তি লাভ করবে।

দস্যুরাণী এবং চন্দনা গাড়িতে চেপে বসলো।

*

রাণীজী, এতক্ষণে দস্যু বনহুরের সলিল সমাধি হয়েছে। সাধ্য নেই সে ঐ ভয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাস থেকে উদ্ধার পায়। এখন আমরা নিশ্চিন্ত, আমাদের যে অনুচরগণকে সে আটক করে রেখেছে তাদেরকে উদ্ধার করা মোটেই আর কষ্টকর হবে না। কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বললো দস্যুরাণীর একজন অনুচর।

চন্দনা একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললো– দস্যু বনহুর যত শক্তিশালী আর বুদ্ধিমানই হোক না কেন, এবার তাকে যমালয়ে যেতে হলো। সে ভাবতেও পারেনি কেউ তাকে কাহিল করতে পারবে বা পারে। সত্যি রাণী, দস্যু বনহুর যখন কাপালিকের বেশে মঞ্চে এসে দাঁড়ালো তখন আমার কেমন সন্দেহ হলো, কারণ কাপালিকের বেশে জগাই আসার কথা, কিন্তু…

হাঁ, আপনি ঠিক বলছেন চন্দনা দিদি, জগাইবেশী অন্য কেউ কাপালিক সেজে মঞ্চে উপস্থিত হবে, এটা আমরা ভাবতেও পারিনি, নইলে দেখিয়ে দিতাম কত শক্তি কাপালিকের দেহে।

মাধবের কথায় বললো চন্দনা–আসলে সে কি কাপালিক ছিলো– কাপালিকবেশী স্বয়ং দস্যু বনহুর।

এতক্ষণ নিশ্চুপ ছিলো দস্যুরাণী।

এবার সে বললো–কাপালিক যদি দস্যু বনহুর হয় তাহলে চন্দনাকে যে রক্ষা করলো সে কে

চন্দনা বলে উঠলো–নিশ্চয়ই কোনো মহৎ ব্যক্তি যিনি আমাদের দর্শকদের আসনেই উপবিষ্ট ছিলেন। কাপালিকবেশী দস্যু বনহুর যখন আমাকে নিয়ে উধাও হবার চেষ্টা করলো তখন তিনি নীরব থাকতে পারেন নি।

তোর অনুমান সত্য চন্দনা, সে যেই হোক মহামানব বটে, না হলে সে এমনভাবে ছুটে যেতো না তোর উদ্ধার ব্যাপারে কিন্তু তার ছিলো আমাদের কাছে আত্নগোপনের চেষ্টা, নইলে সে তোকে উদ্ধার করার পর এগিয়ে আসতে পারতো......

হাঁ রাণী, লোকটা কে, সত্যি বিস্ময় লাগছে ভাবলে। অদ্ভুত শক্তিশালী তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে উদ্দেশ্য তার মহৎ, নাহলে আমাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসবে কেন?

দস্যুরাণী একটু শব্দ করে উঠলো–হু। তারপর বললো–সে যেই হোক এবং যে উদ্দেশ্য নিয়েই আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসুক আমি তাকে খুঁজে বের করবোই, কারণ তার গাড়ির নাম্বারও আমি স্মরণ রেখেছি।

সত্যি বলছো রাণী?

হা চন্দনা।

উঃ! কি সাংঘাতিক অবস্থায় না কেটেছে আমার। একটু থেমে বললো চন্দনা–আচ্ছা রাণী, শো কি চলবে এরপরও?

না চালিয়ে উপায় নেই, কারণ টিকেট আমাদের চলে গেছে জনগণের হাতে হাতে।

গতরাতে শো শেষ না হতেই যে বিভ্রাট ঘটলো তার কি হবে?

পুনরায় শো চলবে এবং গত রাতের ঘটনাটা দর্শকমহলকে জানিয়ে দিতে হবে।

চন্দনা বললো–আরও জানাতে হবে যে দস্যু বনহুর আর ইহজগতে নেই। সে সলিল সমাধি লাভ করেছে।

পুনরায় দস্যুরাণী অস্ফুট শব্দ করে উঠলো–হু!

রাতে শো শুরু হলো।

অগণিত দর্শক ভিড় জমিয়েছে হলের সম্মুখে।

গত দুদিনের চেয়ে আজ আরও বেশি দর্শক এসেছে নৃত্যদৃশ্য উপভোগ করার জন্য।

কিন্তু দস্যুরাণীর মুখ প্রসন্ন নয়, কি যেন সে গভীরভাবে ভাবছে।

এক সময় শো শেষ হলো।

আশাতীত উপঢৌকন আর স্তূপকারে অর্থে ভরে উঠলো দস্যুরাণীর কক্ষ।

শোর শুরুতে ম্যানেজারের বেশে দস্যুরাণীর প্রধান অনুচর রহমত দর্শকমহলকে উদ্দেশ্য করে গতরাতের ঘটনা জানিয়ে দিলো এবং যে ব্যক্তি দর্শকমহল থেকে এগিয়ে এসেছিলেন রাজকুমারীকে উদ্ধার করতে তাকে ধন্যবাদ জানালো সে কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে।

*

পরদিন।

চন্দনা ব্যস্তসমস্ত হয়ে পড়েছে।

সারাটা দিন রাণীজীর সন্ধান নেই।

কোথায় গেছে সে কে জানে।

চন্দনা ভাবছে।

দস্যুরাণীর অনুচরগণও কেউ জানে না কোথায় গেছে রাণীজী।

সন্ধ্যার কাছাকাছি দস্যুরাণীর হঠাৎ আবির্ভাব হলো।

চন্দনার মুখে হাসি ফুটলো।

অনুচরগণ যারা নানা রকম ছদ্মবেশে নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে তারাও চিন্তিত হয়ে পড়েছিলো।

রাণীকে সুস্থ দেহে ফিরতে দেখে তারা খুশি হলো।

চন্দনা জড়িয়ে ধরলো দস্যুরাণীকে–কোথায় গিয়েছিলে রাণী?

হেসে বললো দস্যুরাণী–তোর উদ্ধারকারীর সন্ধানে।

বলো কি রাণী!

হাঁ। দস্যুরাণী কোমর থেকে বেল্ট খুলতে খুলতে ছোট্ট জবাব দিলো।

চন্দনা ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো তার পাশে, বললো–সত্যি, বলছো?

বললাম তো সত্যি?

পেলে তার সন্ধান

পেয়েছি!

রাণী!

হাঁ।

কে সে, কি তার পরিচয়, কেমন তার বয়স?

সব তোকে খুটিয়ে খুঁটিয়ে বলতে হবে?

বললে বুঝবো কি করে, বললো রাণী?

চন্দনা, তোর দেখছি বিপুল আগ্রহ।

বারে, আগ্রহ হবে না? আমাকে যে দস্যু বনহুরের কবল থেকে উদ্ধার করলো তাকে জানার জন্য আমি উন্মুখ হয়ে আছি রাণী। বলল আমার যে আর তর সইছে না।

তবে শোন চন্দনা। অনেক সন্ধান করবার পর সেই নাম্বার পেয়েছি। যে তোকে উদ্ধার করেছে এবং তোর শত্রুকে ব্রীজ থেকে জলোচ্ছাসের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে……

কে তিনি? নিশ্চয়ই কোনো মহান মহৎ ব্যক্তি যার তুলনা হয় না সাধারণ ব্যক্তির সঙ্গে?

কিন্তু যে তোকে উদ্ধার করেছে সে.......কথা শেষ না করে থামলো দস্যুরাণী।

চন্দনা বিপুল আগ্রহ নিয়ে বলে–সে কে বলো রাণী, বলো?

এক মাতাল।

মাতাল!

হাঁ, হরদম সে নেশা করে।

সত্যি বলছো?

সত্যি নয় তো কি মিথ্যা বলছি। অনেক সন্ধান করে তারপর পেয়েছি সেই নাম্বার।

তারপর?

যে হোটেলের সম্মুখে গাড়িখানাকে পেলাম ঐ হোটেলের তিন তলায় খুঁজে পেলাম তাকে।

রাণী!

হা।

কেমন লোক

বললাম তো মাতাল।

আশ্চর্য।

হাঁ আশ্চর্য বটে, দেখলাম তিনতলার তিন নম্বর ক্যাবিনে সে ড্রিয়ায় মগ্ন। অনেক ডাকাডাকিতে চোখ মেলে তাকালো সে। চেহারা দেখে মনে হলো কথা না

বলেই চলে আসি কিন্তু এত বড় উপকার যে করেছে তাকে অবহেলা করতে পারলাম না।

তার মানে

লোকটাকে দেখে মনে হলো সে মানুষ নয়ররাক্ষস।

নররাক্ষস?

হাঁ, মাথায় লম্বা অদ্ভুত ধরনের চুল। দাঁতগুলো বড় এবং ধারালো বলে মনে হলো। চোখে দুটো তার দেহের আকারে ছোট কিন্তু তীব্র এবং লাল। ঠোঁট দুটো মোটা, কতকটা উল্টানো। যদিও ভদ্রলোকের দেহে মূল্যবান চাদর ছিলো তবু বেশ বুঝতে পারলাম দেহের চামড়া গন্ডারের চামড়ার মত শক্ত এবং কিছু কিছু লোম আছে।

তারপর, তারপর কি দেখলে

হাত দু'খানা আগুনে ঝলসানো বলে মনে হলো। ভদ্রলোক চোখ মেলতেই আমাকে দেখে থমথম খেয়ে উঠে বসতে যাচ্ছিলো, আমি তাকে বললাম– আপনাকে উঠতে হবে না, শুয়ে থাকুন। ভদ্রলোক কিছু বলতে গেলো কিন্তু জড়িয়ে এলো তার কথাগুলো। আরও লক্ষ্য করলাম হাত দু'খানা সে বারবার চাদরের তলায় চাকতে চেষ্টা করছিলো।

চন্দনার মুখমন্ডল কেমন যেন নিষ্প্রভ হয়ে উঠলো, বললো–তুমি কি আমাকে দেখাতে পারো সেই লোকটাকে

নিশ্চয়ই পারি, সত্যি এমন লোক আমি দেখিনি কোনোদিন কোথাও।

তোমাকে তিনি কি বললেন?

আমাকে দেখে অবাক চোখে তাকিয়ে রইলো, যেন সে আমার অন্তরের ভিতরটা দেখতে চাইলো। আমি নিজেই বললাম, ধন্যবাদ জানাচ্ছি নোমান।

তার নাম নোমান তুমি কি করে জানলে রাণী?

নাম জানব না? তার সব পরিচয় আমি জেনে নিয়ে তারপর হাজির হয়েছিলাম তার সম্মুখে। লোকটা সাধারণ মানুষ নয়।

কেমন করে বুঝলে?

বুঝলাম তার আচরণে, বুঝলাম তাকে দেখে……আমি তাকে ধন্যবাদ জানালাম কিন্তু সে কোন কথা বললো না।

আশ্চর্য বটে!

হাঁ, আশ্চর্য, আমাকে বসতে পর্যন্ত বললো না সে। একটু থেমে বলল দস্যুরাণী–আমার মনে হচ্ছে লোকটা এত বেশি নেশা করেছিলো যে তার সংজ্ঞা ছিলো না। মাথা উঁচু করে আমাকে একটু দেখলো, তারপর আবার মাথা গুজলো বালিশের মধ্যে।

চন্দনা বললো–কথা দাও আমাকে নিয়ে যাবে?

নিশ্চয়ই যাবো।

তুমি যে বর্ণনা দিলে তাতে মনে হচ্ছে লোকটা খুব বুদ্ধিমান এবং চতুর। উপকার করে বাহবা নিতে রাজি নয়।

ঠিক বলেছিস চন্দনা।

সেইদিন শো শুরু হবার পূর্বে অনুচরদের জানিয়ে দিলো দস্যুরাণী এত নম্বর গাড়িখানার প্রতি তারা যেন লক্ষ্য রাখে। গাড়িখানা এলে তারা যেন জানায়।

অনুচরগণ নানাভাবে নানা ছদ্মবেশে নানা স্থানে আত্মগোপন করে রইলো। গাড়ির নম্বরটা লিখে তারা নিজ নিজ পকেটে রাখলো সাবধানে।

দস্যুরাণী শো চলাকালে প্রতি মুহূর্ত অপেক্ষা করছিলো না জানি কোন দন্ডে সংবাদ আসবে ঐ নম্বরের গাড়ি এসেছে। কিন্তু তার প্রতীক্ষা সফল হলো না, ঐ নম্বরের গাড়ি এলো না, কেউ সংবাদ নিয়েও হাজির হলো না দস্যুরাণীর কাছে। কতকটা অবাক হলো দস্যুরাণী, কারণ ঐ ব্যক্তি আজ আর এলো না।

পরদিন শো শুরু হবার পূর্বে দস্যুরাণী স্বয়ং এলেন সম্মুখে সন্ধান করলো কিন্তু ঐ নম্বরের গাড়িখানা নজরে পড়লো না। দস্যুরাণী তবু সন্ধান করা থেকে ক্ষান্ত হলো না।

রাত বাড়ছে।

হঠাৎ দস্যুরাণীর এক অনুচর এসে তাকে জানালো, যে নাম্বারের গাড়িখানা রাণীজী সন্ধান করছেন ঐ গাড়িখানা এসেছে।

দস্যুরাণীর দেহে তখন পুরুষের ড্রেস।

মঞ্চে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলো দস্যুরাণী, কথাটা শুনে সে চন্দনাকে বললো–চন্দনা তোর রক্ষাকারী সেই মহান ব্যক্তিটি এসেছে।

মুহূর্তে চন্দনার চোখ দুটো আনন্দে জ্বলে উঠলো, বললো সে সত্যি!

হা। সে আমার সঙ্গে।

চন্দনা আর দস্যুরাণী এসে দাঁড়ালো বেলকুনির সিঁড়ির মুখে যেখান থেকে গোটা হলঘর দেখা যায় ঠিক সেই জায়গায়। তারা প্রতিটি দর্শককে দেখতে পাবে কিন্তু দর্শক মহলের কেউ তাদেরকে দেখতে পাবে না।

দস্যুরাণীর পাশে চন্দনা।

দস্যুরাণীর সন্ধানী দৃষ্টি সন্ধান করে ফিরছে চন্দনার উদ্ধারকারী সেই অদ্ভুত মানুষটাকে।

কিন্তু কই, সে তো নেই। অনেক খোঁজ করেও দস্যুরাণী তাকে দেখতে পেলো না।

ওদিকে মঞ্চে যাবার জন্য চন্দনার সময় হয়ে গেছে।

দস্যুরাণী বললো–তুই যা চন্দনা, আমিও আসছি।

চন্দনার মুখটা ম্লান হয়ে গেলো।

তবু সে চলেগেলো মঞ্চে যাবার উদ্দেশ্য নিয়ে।

দস্যুরাণীর দৃষ্টি তখনও দর্শকদের মধ্যে সেই ব্যক্তিটাকে খুঁজে ফিরছে।

ভাবছে গাড়ি এসেছে কিন্তু লোকটা গেলো কোথায়। লোকটা কোনো গোয়েন্দা বিভাগের নয় তোক হয়তো তাই হবে, সে গোপনে সন্ধান নিচ্ছে আজও কোনো দুষ্টলোক হলে এসেছে কিনা। কিন্তু কাল রাতে যাকে সে ব্রীজ থেকে নদীগর্ভে ফেলে দিলো সেই কি দস্যু বনহুর? তবে কি সত্যি দস্যু বনহুর চন্দনাকে উধাও করতে চেয়েছিলো? দস্যুরাণী আরও ভাবছে দস্যু বনহুরের সঙ্গে তার সন্ধির কথা। দস্যু বনহুরের সঙ্গে সন্ধি হয়েছিলো রক্তে আঁকা ম্যাপের বিনিময়ে কিন্তু সে সন্ধি কার্যকরী হয়নি, কারণ রক্তে– আঁকা ম্যাপখানা সে বনহুরের কাছে অর্পণ করেনি। যে ম্যাপ লাভ করতে দস্যুরাণীকে চরম সংগ্রাম করতে হয়েছে, এত সহজে সে তা হাতছাড়া করতে মোটেই রাজি নয়, এবং সে কারণেই দস্যুরাণী বনহুরকে আটক করতে মনস্থ করেছিলো, যেন সে রক্তে আঁকা ম্যাপের ব্যাপারে কোনো রকম হস্তক্ষেপ করতে না পারে......দস্যুরাণী আপন মনে বলে উঠলো– সেদিন আমি তার কথায় রাজি হয়েছিলাম রক্তে আঁকা ম্যাপ তাকে দেবো, কিন্তু...হঠাৎ চমকে উঠলো দস্যুরাণী, ঐ যে সেই ব্যক্তি যাকে সে সন্ধান করে চলেছে। লোকটা সবার অলক্ষ্যে পিছন সারির একটা আসন দখল করে নিয়ে বসলো। বারবার লোকটা রুমালে মুখ মুছছে। না, কেনো ভুল হয়নি দস্যুরাণীর ঐ ব্যক্তিই মিঃ নোমান।

কিন্তু আর সময় নেই, মঞ্চে যাবার জন্য বারবার ইংগিত হচ্ছে।

দস্যুরাণী সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলো নিচে।

শো তখনও শেষ হয়নি, গ্রীনরুমের ভেতর থেকে হঠাৎ চিৎকার করে বেরিয়ে এলো দস্যুরাণীর এক অনুচর। সে থর থর করে কাঁপছে। চোখেমুখে তার ভীতির চিহ্ন।

সঙ্গে সঙ্গে পর্দা পড়লো।

আলো জ্বলে উঠলো। কেউ কিছু ভেবে পাচ্ছে না, শো চলাকালে এ কি ব্যাপার!

এত তীব্র চিৎকার যে দর্শক মহলেও চঞ্চলতার পরিলক্ষিত হলো।

ছুটে এলো দস্যুরাণী আর চন্দনা।

উভয়ের মুখেই একটা উকুণ্ঠা ভাব ফুটে উঠেছে। তাকালো উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে। গ্রীনরুমের বাইরে থামের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থরথরিয়ে কাঁপছি তার একজন অনুচর। দস্যুরাণী আর চন্দনার নজর গিয়ে পড়লো অনুচরটার উপর। দ্রুত এগিয়ে গেলো ওরা অনুচরটার পাশে।

ব্যস্তকণ্ঠে বলল দস্যুরাণী–কি হয়েছে, অমন করছো কেন?

অনুচরটা শুধু আংগুল দিয়ে গ্রীনরুমের পিছন দিকটা দেখিয়ে দিলো।

চন্দনা বললো–রাণী, নিশ্চয়ই এদিকে কিছু ঘটেছে। চলো দেখি।

দস্যুরাণী আর চন্দনা ছুটলো সেইদিকে।

গ্রীনরুমের পিছন অংশে প্রবেশ করতেই একসঙ্গে চন্দনা ও দস্যুরাণী অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো। চন্দনা দু'হাতে চোখ ঢেকে ফেললো।

দস্যুরাণীও মুখটা ফিরিয়ে নিয়েছিলো, এবার সে আবার তাকালো সেইদিকে। গ্রীনরুমের একদিকের দেয়ালের পাশে পড়ে আছে একটা লোক, তার বুক চিরে ফেলা হয়েছে। বুকের মধ্যে কলিজা বা হৎপিন্ড কিছু নেই, শুধু লাল টক টক করছে রক্ত মাখানো পাঁজরের হাড়গুলো। সেকি ভীষণ আর মর্মান্তিক দৃশ্য!

অল্পক্ষণেই সেখানে জড়ো হলো অগণিত মানুষ।

পুলিশমহলে সংবাদটা পৌঁছাতে বিলম্ব হলো না। পুলিশপ্রধান স্বয়ং এসে হাজির হলেন, তার সঙ্গে পুলিশ অফিসারগণ রয়েছেন। সবাই বিস্মিত হতবাক হলেন–যে দৃশ্য তারা দেখলেন তা কল্পনার বাইরে। এমন নৃশংস হত্যাকান্ড কেউ কোনোদিন দেখেছে কিনা সন্দেহ।

সবার চোখেমুখেই আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠেছে। নির্বাক সবাই, কারও মুখে যেন কোনো কথা নেই!

পুলিশ সুপার মিঃ লোদী স্বয়ং উপস্থিত হলেন। তিনি মৃতদেহ দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। মৃতদেহটা তিনি সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করে একটা

অস্ফুট শব্দ করে বললেন বিস্ময়কর হত্যাকান্ড! কেউ নিহত ব্যক্তির বুক চিরে ভিতর থেকে কলিজা সহ হৃৎপিন্ড টেনে ছিঁড়ে বের করে নিয়েছে। নিশ্চয়ই এটা মানুষের কাজ নয়।

পুলিশ অফিসারগণ যারা দাঁড়িয়ে ছিলেন একবার সবাই এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করে নিলেন।

দস্যুরাণী তাকালো চন্দনার মুখের দিকে।

সমস্ত হল জুড়ে একটা ভীষণ ভীতিভাব ছড়িয়ে পড়লো, কারও মুখে কোনো কথা নেই, শুধু লোকজন এদিক ওদিক ছুটাছুটি করছে।

হলে যারা শো দেখার জন্য ভীড় জমিয়েছিলো তারা সবাই কখন কোন ফাঁকে সরে পড়েছে কেউ তা জানে না।

অল্প সময়ে হলশূন্য হয়ে গেলো।

শুধু রইলো পুলিশ বাহিনী আর রইলেন লোজন, আর রইলো দস্যুরাণী ও তার সহকারীরা।

দস্যুরাণী একসময় বাইরে এসে লক্ষ্য করলো একটা গাড়িও হলের বাইরে দাঁড়িয়ে নেই, শুধু পুলিশ বাহিনীর গাড়িগুলো অপেক্ষা করছে।

অল্পক্ষণেই লাশ নিয়ে পুলিশ বাহিনী বিদায় গ্রহণ করলো।

কিন্তু দস্যুরাণীর মনে একটা ভয়ানক চিন্তার ছাপ পড়লো। কে এই নৃশংস হত্যাকান্ড সংঘটিত করেছে–মানুষ না কোনো জন্তু

এই অদ্ভুত হত্যাকান্ড নিয়ে শহরে একটা ভীষণ চাঞ্চল্য দেখা দিল। সবার মুখে ঐ একই কথা–কি সাংঘাতিক খুন! একে খুন বলা চলে না, কোনো হিংস্র জন্তু বা হিংস্র ব্যক্তির শিকার এই নিহত ব্যক্তি।

কিন্তু কে সেই খুনী কেউ তার সন্ধান পেলো না।

পুলিশ গোয়েন্দা বিভাগ নানাভাবে সন্ধান চালিয়ে চললো তবু কোনো সূত্র খুঁজে পেলো না।

দস্যুরাণী নিজেও হতভম্ব হয়ে পড়েছে। হঠাৎ এমনভাবে কে এই হত্যাকান্ড সংঘটিত করলো, এ নিয়ে তার চিন্তার অন্ত রইলো না।

সেদিনের পর থেকে শো বন্ধ নয়ে গেলো। যে কারণে তারা কান্দাই এসেছিলো সে কাজ কতদূর সমাধা হলো চন্দনা তা জানে না, তবে তার বিশ্বাস দস্যুবনহুর মৃত্যুবরণ করেছে।

চন্দনা বললো–রাণী, চলো ফিরে যাই। দস্যু বনহুরকে আটক করবো বলে এসেছিলাম, কিন্তু তাকে আটক করতে হলো না, সে সবাইকে ফাঁকি দিয়ে পরপারে পাড়ি জমিয়েছে।

দস্যুরাণী চন্দনার কথায় মৃদু হাসলো, বললো–সে সবার চোখে ফাঁকি দিয়ে পরপারে পাড়ি জমিয়েছে না আমাদের চোখে ধোকা দিয়ে এই অদ্ভুত হত্যাকান্ড সংঘটিত করেছে, কে জানে?

রাণী, তুমি কি মনে করা দস্যু বনহুর সলিল সমাধি বরণ করেনি? সেই কি এই হত্যাকান্ড সংঘটিত করেছে?

হতেও পারে। চন্দনা, দস্যু বনহুরের কার্যকলাপ সব বিস্ময়কর। সে সব পারে, এমন কি নরহত্যা করে তার হৃৎপিন্ড বের করে নিতেও পারে।

তাহলে কি তুমি মনে করো এই হত্যাকান্ড দস্যু বনহুর…

ঠিক এটা সত্য নাও হতে পারে তবে তার অসাধ্য কিছু নেই, তাও সত্য। চন্দনা, এ হত্যাকান্ড যত রহস্যময়ই হোক না কেন, এর পিছনে নিশ্চয়ই একটা উদ্দেশ্য লুকানো আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। চন্দনা, আমি এই হত্যারহস্য উদঘাটন করবোই।

চন্দনা বললো –রাণী, তুমি রক্তে আঁকা ম্যাপখানা বনহুরের হাতে অর্পণ করেনি বলেই সে এমনভাবে তোমার পিছু লেগেছে।

চন্দনার কথায় খিলখিল করে হেসে উঠলো দস্যুরাণী–দস্যু বনহুর আমার পিছু লেগেছে না আমি তার পিছু লেগেছিঃ চন্দনা, আমি সেদিন দস্যু বনহুরের কথায় রাজি হলেও মনে প্রাণে রাজি হয়নি বা হবো না কোনোদিন……তারপর দাতে দাঁত পিষে বলে দস্যুরাণী–যে রক্তে আঁকা ম্যাপ সংগ্রহ করতে আমাকে এত

সাধনা করতে হয়েছে, আমি সেই রক্তে আঁকা ম্যাপ এত সহজে তুলে দেবো দস্যু বনহুরের হাতে? না, কখনই না, ও ম্যাপ সে পাবে না......।

হাঁ, তুমি আরও কয়েকদিন এ কথা বলেছো রাণী। দস্যু বনহুর আর তোমার মধ্যে কথা হয়েছিলো মানে তোমরা শপথ গ্রহণ করেছিলে, সেই সংবাদ আমার কানে পৌঁছার পর আমি আমি আশ্চর্য হয়ে তোমাকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলাম, সেদিন তুমি হেসে এই কথাই বলেছিলে। রাণী, কি প্রয়োজন ছিল সেদিন ওকে কথা দিয়ে?

কতকটা বাধ্য হয়েই আমি তার কথায় রাজি হয়েছিলাম–যাক সে কথা......

রাণী, তুমি এড়িয়ে চলতে চাও কিন্তু সে যদি বেঁচে থাকে মানে তার যদি সলিল সমাধি না হয়ে থাকে তাহলে সে তোমাকে......

জানি এবং সেজন্যই আমিই তাকে শায়েস্তা করবে বা করতে চাই অবশ্য যদি সে জীবিত থাকে।

তাহলে তুমি এখন কান্দাই ত্যাগ করতে চাও না রাণী?

না, যতদিন না এই হত্যারহস্য উদঘাটিত হয়েছে ততদিন আমি কান্দাই ত্যাগ করবো না চন্দনা। হয়তো এই হত্যারহস্য উদঘাটন করতে গিয়ে আরও রহস্য উদঘাটিত হয়ে পড়বে এবং আমি তাই করতে চাই।

তোমার কি মনে হয় তুমি এই হত্যারহস্য উদঘাটন করতে সক্ষম হবে রাণী?

নিশ্চয়ই হব বলে আমার বিশ্বাস! দস্যুরাণী দৃঢ়কণ্ঠে বললো।

*

সর্দার, দস্যুরাণী আপনাকে আটক করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। নানাভাবে কৌশলে আপনার সন্ধান করে ফিরছে সে। আপনি তবু কেন দস্যুরাণীর সহচারী চন্দনাকে উদ্ধার করতে গেলেন।

মোহসীন আমি কর্তব্য পালন করেছি। দস্যুরাণী আমার পিছু লেগেছে বলে আমি তাদের বিপদ মুহূর্তে থাকতে পারি না।

কিন্তু……

জানি মোহসীন, সব জানি। তা ছাড়াও দস্যুরাণী আমার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেও কথা রক্ষা করেনি। সে যত সাবধানই হোক না কেন রক্তে আঁকা ম্যাপ আমার চাই……

সর্দার!

হাঁ মোহসীন, বিশেষ করে কথা দিয়ে সে কথা রাখেনি, তাই আমি তাকে দেখে নিতে চাই কত শক্তিশালিনী সে। একটু হেসে বলে সে আমাকে আটক করে নিজের কৃতিত্ব ফলাও করতে চায়।

মোহসীন বলে উঠলো–সর্দার, জানি দস্যুরাণী তো দূরের কথা, আপনাকে আটকে রাখে সাধ্য নেই কারও। দস্যুরাণী নিজেও তার প্রমাণ পেয়েছে, কারণ তার গুপ্তগুহার দুর্গম কারাকক্ষ থেকে আপনি অনায়াসে বেরিয়ে এসেছেন বা কেউ ভাবতেও পারেনি। সর্দার, একটা কথা বলবো……

বলো?

কি করে আপনি দস্যুরাণীর সেই দুর্ভেদ্য কারাকক্ষ থেকে পালাতে সক্ষম হলেন জানার জন্য আমাদের মন উদগ্রীব হয়ে আছে। সর্দার, যদিও আমরা জানি আপনার অসাধ্য কিছু নেই তবুও বড় সখ, বড় সাধ……বেয়াদবি মাফ করবেন সর্দার।

বনহুর একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে এক মুখ ধোয়া ছেড়ে বললো–শুধু তুমি নও, আমার প্রত্যেকটা অনুরাগী যারা তাদের সবার মনেই ঐ এক প্রশ্ন, আমি কিভাবে দস্যুরাণীর কারাকক্ষ থেকে বেরুতে সক্ষম হলাম।

সর্দার, সত্যি বলতে কি আপনার অনুমান সত্য।

মোহসীন, হাঙ্গেরী কারাগার আমাকে আটকে রাখতে পারেনি। মনে রেখো পৃথিবীর কোনো কারাকক্ষই আমাকে আটকে রাখতে পারবে না। দস্যুরাণীর দূর্গম দুর্ভেদ্য কারাকক্ষ সত্যি কঠিন স্থান তবু আমি অতি সহজে বেরিয়ে এসেছি বা আসতে সক্ষম হয়েছি। হাঁ, এবার শোন মোহসীন, কি করে আমি সেদিন দস্যুরাণীর গুপ্ত কারাকক্ষ থেকে বেরিয়ে এসেছি বলছি।

বলুন সর্দার

একটা কথা মনে রেখো মোহসীন, যাদুবিদ্যা আমি জানি না কিন্তু যাদুর কৌশল আমি জানি। সেদিন কারাকক্ষে যখন আমাকে আটকে রেখে প্রহরীরা চলে গেলো, তখনই আমি বুদ্ধি এটে নিলাম কি করে কারাকক্ষ থেকে বের হবো। একজন প্রহরীর দেহ ঠিক আমারই মত উঁচু ছিলো, আমি তার সঙ্গে খাতির জমিয়ে নিলাম এবং সে যখন আমাকে খাবার দেবার জন্য কারাকক্ষে প্রবেশ করলো তখন আমি প্রস্তুত ছিলাম, তাকে কৌশলে আড়ালে এনে তার হাতমুখ বেঁধে ফেললাম তারপর তার দেহ থেকে খুলে নিলাম তার পোশাক। যখন আমি তার পোশাক পরে এবং খাবারের শূন্য বাসন হাতে বেরিয়ে এলাম তখন আমাকে কেউ চিনতে পারলো না।

তারপর হাজির হলাম মনিরার বন্দীশালায়......

সর্দার, আপনার নিপুণ ছদ্মবেশ কেউ কোনোদিন ধরতে পারেনি, পারবেও না জানি.......

শুধু দস্যুরাণীর অনুচরগণই নয়, দস্যুরাণী স্বয়ং এবং তার সহচরীও আমাকে চিনতে পারতো না যদি আমি তাদের সম্মুখে হাজির হয়ে পরিচয় না দিতাম। যা এবার সব শুনলে তো?

হ, শুনলাম সর্দার। একটা কথা বলতে চাই।

বলো?

দস্যুরাণীর সহচরী চন্দনাকে মঞ্চ থেকে কাপালিকের বেশে কে হরণ করেছিলো সেদিন।

সে এক বিস্ময়কর কাহিনী মোহসীন। দস্যুরাণীর এক মহাভক্ত আছে–তার নাম দুর্গাদাস।

দুর্গাদাস...সে তো আপনার হাতে নিহত হয়েছে সর্দার।

না, এ দুর্গাদাস সে নয়, এ দূর্গাদাস অন্য লোক। এর জন্মস্থান হলো রায়হান দ্বীপের কোনো এক অজানা স্থানে। দস্যুরাণীর পিছু নিয়েছে দুর্গাদাস অনেকদিন

আগে যেখে, তারাও লক্ষ্য ঐ রক্তে আঁকা ম্যাপ।

সর্দার।

হাঁ, মোহসীন। দুর্গাদাস অসীম শক্তিশালী এবং চালাক তবু সে দস্যুরাণীর সঙ্গে পারেনি, বারবার সে মার খেয়েছে দস্যুরাণীর কাছে। একবার সে দস্যুরাণীর হাতে ভীষণ আহত হয়েছিলো, তাতে তার জীবন নাশের আশংকা ছিলো কিন্তু ভাগ্য প্রসন্ন তাই বেঁচে গেছে বা জীবন লাভ করেছে। তারপর থেকে দস্যুরাণীকে সায়েস্তা করার জন্য সে উঠেপড়ে লেগেছে।

বনের কি সর্দার

হাঁ মোহসীন, এবং সেই কারণেই দুর্গাদাস কান্দাই পর্যন্ত এসে হাজির হয়েছে।

সর্দার, আপনি এত কথা জানলেন কি করে জানতে পারি কি?

পৃথিবীর কোনো সংবাদ আমার অজানা নেই বা আমার কানে এসে পৌঁছে না। দূর্গাদাসের সঙ্গে দস্যুরাণীর কলহ আজকের নয়, বহুদিনের এবং তা দিন দিন জটিল আকার ধারণ করছে। দুর্গাদাস শেষ পর্যন্ত এসে হাজির হয়েছে কান্দাই শহরে। অবশ্য দস্যুরাণী জানে না দুর্গাদাস এখনও জীবিত আছে।

সর্দার, এ কথা সত্যি?

হাঁ মোহসীন, কারণ দস্যুরাণীর রিভলভারের গুলী একদিন দুর্গাদাসকে আহত করেছিলো এবং সে মৃত্যুবরণ করেছিলো এটাই জানে দুস্যরাণী কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে মৃত্যুবরণ করেনি।

এবং সে দস্যুরাণীর পিছু নিয়েছে.....

হাঁ, কিন্তু দস্যুরাণী তা আজও জানে না এবং সেদিন কাপালিকের বেশে দুর্গাদাস মঞ্চ থেকে দস্যুরাণীকে হরণ করতে যেয়ে ভুল করে সে চন্দনাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলো।

সর্দার।

হুঁ, মোহসীন।

সর্দার, আপনি কি করে জানলেন ঐ ব্যক্তিই দুর্গাদাস যে কাপালিকের বেশে মঞ্চে এসেছিলো।

আমি দুর্গাদাসকে ভালভাবে চিনি, কারণ তার সঙ্গে একবার আমার মোকাবেলা হয়েছিলো।

তাহলে চন্দনাকে দুর্গাদাস কাপালিকের বেশে হরণ করতে চেয়েছিলো, তাই না সর্দার

চন্দনাকে নয়, দস্যুরাণীকে–এ কথা পূর্বেই তোমাকে বললাম। দূর্গাদাস অবশ্য শেষ পর্যন্ত জানতে পারেনি সে কাকে মঞ্চ থেকে এনেছে। হাঁ, আমি ঐ মুহূর্তে যদি দুর্গাদাসের গাড়িখানা অনুসরণ না করতাম তাহলে দস্যুরাণীর সাধ্য ছিলো না তাকে উদ্ধার করে।

সর্দার, আপনি ঐ মুহূর্তে যার গাড়ি ব্যবহার করেছিলেন তিনি কে এবং কি করেন?

এর জবাব তুমি পাবে এবং জানতে পারবে কিন্তু আজ নয়।

এমন সময় সহসা কক্ষে প্রবেশ করে রহমান, চোখেমুখে বেশ একটা উদ্বিগ্নতার ছাপ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

সর্দারকে কুর্ণিশ জানিয়ে বলে–সর্দার, একটা দুঃসংবাদ।

দুঃসংবাদ!

হাঁ, কাল রাতে যখন শো শুরু হয়েছিলো তখন একটা ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটে। হলের গ্রীনরুমে একটা লোককে মৃত অবস্থায় দেখা যায়।

তারপর?

তার বুক চিরে বের করে নেওয়া হয়েছে কলিজা সহ হৃৎপিন্ড। নিশ্চয়ই কোনো জন্তু তার কলিজা সহ হৎপিন্ডও ভক্ষণ করেছে বলে সবার ধারণা.....

কিন্তু কেউ সেই জন্তুটিকে দেখেনি, তাই না?

হা সর্দার।

বনহুর আংগুল থেকে অর্ধগদ্ধ সিগারেট এ্যাসট্রের মধ্যে খুঁজে রেখে বললো–এ হত্যারহস্য বিস্ময়করই শুধু নয়, একেবারে আশ্চর্যজনক, কারণ তুমি যা বলছো নিহত ব্যক্তির বুক চিরে তার কলিজা সহ হৃৎপিন্ড টেনে বের করে কেউ ভক্ষণ করেছে।

হাঁ, তাই সর্দার। আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি।

আমার দুর্ভাগ্য যে আমি এ সময় সেখানে ছিলাম না। যা তুমি ছিলে তার সঙ্গী, কারণ সবকিছু তোমার মুখে জানতে পারলাম।

বসো রহমান, কিছু কথা আছে তোমার সঙ্গে। তারপর মোহসীনকে লক্ষ্য করে বললো–তুমিও বসো মোহসীন।

রহমান এবং মোহসীন আসন গ্রহণ করলো।

বনহুর পুনরায় সিগারেট কেস থেকে নতুন একটা সিগারেট বের করে তাতে অগ্নিসংযোগ করলো, তারপর কুঞ্চিত করে বললো–রহমান, আমি দস্যুরাণীর আচরণে ক্ষুব্ধ, কারণ সে আমার সঙ্গে শপথ রক্ষা না করে আমার বিরুদ্ধাচরণ করে আসছে। আমি নাকি তার সীমানায় প্রবেশ করেছি এবং সে কারণে সে আমাকে আটক করতে বদ্ধপরিকর।

সর্দার, দস্যুরাণীর মনোভাব তাই। কথাটা বললো মোহসীন।

রহমান বললো–কিন্তু আমরা জানি দস্যুরাণী–যা করছে সম্পূর্ণ ভুল, কারণ আপনি বা আমরা তার সীমানায় প্রবেশ করেছি এমন কোনো প্রমাণ নেই। আর যদি করেও থাকি আমরা তার কোনো ক্ষতি সাধন উদ্দেশ্য নিয়ে করিনি, তবু সে আমাদের পিছু লেগেছিলো বলে লেগেছে।

হাঁ রহমান, তোমার কথা নির্ঘাৎ সত্য, দস্যুরাণী আর আমার মধ্যে যখন শপথ গ্রহণ বা সন্ধি আপন হয় তখন আমরা উভয়ে উভয়কে কথা দিয়েছিলাম আমরা কেউ কারও বিরুদ্ধাচারণ করবো না। কিন্তু সে তার শপথ রক্ষা করেনি। একথা তোমাদের আমি বলেছি এবং আজও বলছি রক্তে আঁকা ম্যাপ আমার চাই। যাক সে কথা, এখন নতুন এক চিন্তা আমাকে বিচলিত করে তুললো, তা হচ্ছে এই

রহস্যময় হত্যাকান্ড। এ হত্যাকান্ড অদ্ভুত, বিস্ময়কর এবং অস্বাভাবিক, তোমার কথায় আমি বুঝতে পারছি রহমান।

সর্দার, আমার মনে হয় এমন কোনো জন্তুর আবির্ভাব ঘটেছে যে জন্তু অতি ভয়ঙ্কর। মানুষকে হত্যা করে বুক চিরে শুধু কলিজা আর হৃৎপিন্ড ভক্ষণ করে।

রহমান, এ ধরনের হত্যাকান্ড শুধু আজ নতুন নয়, আরও বহুবার আমি এ ধরনের রহস্যময় হত্যাকান্ডের সম্মুখীন হয়েছি। কথাটা বলে থামলো বনহুর।

মোহসীন বলে উঠলো–সর্দার, আপনি তার সমাধানও করেছেন। একটু থেমে বললো সে–এই হত্যাকান্ডের পেছনে দস্যুরাণীর কোনো চক্রান্ত নেই তো?

বনহুর গভীরভাবে চিন্তা করছিলো।

রহমান বললো–আমারও সেইরকম মনে হয়, দস্যুরাণীর কোনো গোপন অভিসন্ধি এর পেছনে কাজ করছে।

তোমাদের অনুমান সত্যও হতে পারে অথবা নাও হতে পারে, কারণ দস্যুরাণীর বাসনা চরিতার্থ হয়নি–তাই সে এখন নানাভাবে মতলব আঁটছে।

সর্দার, দস্যুরাণী জানে আপনি এ ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকতে পারবেন না, তাই হয়তো আপনাকে.......

হাঁ, এরকম অভিসন্ধি নিয়েও দস্যুরাণী নরহত্যায় লিপ্ত হতে পারে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কথাটা বললো মোহসীন।

বনহুর বললো–এ হত্যারহস্য আমাকে গভীরভাবে ভাবিয়ে তুললো, তবে তার চেয়ে বেশি জরুরি ফুল্লরাকে খুঁজে বের করা। সে যেখানেই থাক ভাল আছে। তবে মালোয়াকে মৃত্যুবরণ করতে হবে, এটা সত্য। নীলমনি হার চুরির চেয়েও ফুল্লরাকে হরণ করার অপরাধ কত গুরুতর আমি তা দেখিয়ে ছাড়বো। রহমান, তুমি ভেবো না আমি নিশ্চুপ আছি..

জানি সর্দার, আমি সব জানি। আপনি একটা দিনও নিশ্চিন্ত নেই, প্রতিদিন গভীর রাতে আপনি সন্ধান করে ফেরেন আমার ফুল্লরার। কথাটা বলতে গিয়ে গলা ধরে আসে রহমানের।

বনহুর একটু চুপ থেকে বললো–দিপালী কোথায় আছে রহমান।

সে আমাদের এই আস্তানায়ই আছে। বললো মোহসীন।

তাকে প্রয়োজন আছে।

আচ্ছা সর্দার, তাকে ডেকে আনছি। বললো মোহসীন।

বনহুর বললো–থাক, আমি নিজেই তার কাছে যাবো। দিপালীর প্রয়োজন আছে, এই হত্যারহস্য উদঘাটনে সে আমাকে সাহায্য করতে পারবে। তাছাড়া ফুল্লরার সন্ধান ব্যাপারেও তাকে দরকার।

রহমান বললো–সর্দার, দিপালী আমাদের যে কোনো কাজে সহায়তা করতে সর্বদা প্রস্তুত আছে এবং সে কারণেই সে কান্দাইয়ের বাইরে গিয়েও থাকতে পারেনি, পুনরায় সে ফিরে এসেছে আমাদের মধ্যে।

হাঁ, আমি সে কথা শুনেছি এবং খুশি হয়েছি অনেক। কথাটা বলে বনহুর উঠে দাঁড়ালো।

এতক্ষণ বনহুর মোহসীন ও রহমানের মধ্যে বনহুরের শহরের আস্তানার ভূগর্ভস্থ একটা কক্ষে বসে কথাবার্তা হচ্ছিলো।

সর্দার উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে তারা উঠে দাঁড়ালো।

বনহুর বললো–ফুল্লরার সন্ধানে আমি দিপালীকে নিযুক্ত করতে চাই। নিশ্চয়ই সে এ ব্যাপারে আমাকে সহায়তা করতে সক্ষম হবে।

সর্দার, দিপালী অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও চালাক, কাজেই সে সব কাজে সফলতা লাভ করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বললো রহমান।

বনহুর কক্ষ ত্যাগ করলো।

রহমান এবং মোহসীনও বেরিয়ে এলো সেই কক্ষ থেকে।

বনহুর দিপালীর কক্ষে প্রবেশ করতেই দিপালীর চোখ দুটো খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি সে এসে প্রণাম করলো বনহুরের পায়ে।

বনহুর মৃদু হেসে বললো–এ অভ্যাস তোমার এখনও আছে দিপালী?

দিপালী কোনো জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো।

বনহুর বললোকই, বসতে বললে না তো?

আপনাকে বসতে বলার সাহস আমার নেই।

তাই নাকি? বেশ, তাহলে আমি নিজেই বসছি।

বনহুর বসলো। হঠাৎ তার দৃষ্টি চলে গেলো ওদিকের দেয়ালে। অবাক না হয়ে পারলো না বনহুর। সে দেখলে দেয়ালে একটা ফটো সুন্দরভাবে টাঙ্গানো এবং ফটোখানা ফুলের মালায় ভরে উঠেছে। সমুখের ধূপদানি থেকে ধীরে ধীরে ধূপের ধুয়া নির্গত হচ্ছে।

বনহুর উঠে এগিয়ে গেলো সেইদিকে। ফটোখানা লক্ষ্য করতেই দেখলো এ তারই ফটো। মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠলে তার ঠোঁটের কোণে। আবার ফিরে এসে আসন গ্রহণ করতে করতে বললো দীপালী, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

দিপালী চোখ দুটো তুলে ধরলো বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর বললো–বসো।

দিপালী বসলো।

বনহুর প্রয়োজনীয় কথাগুলো দিপালীর কাছে গুছিয়ে বললো, কিভাবে তাকে ফুল্লরার সন্ধানে নামতে হবে, কিভাবে কাজ করবে সে, সব ভালভাবে বুঝিয়ে বললো তাকে।

দিপালী মনোযোগ সহকারে সব শুনলো এবং সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করবে বলে কথা দিলো।

বনহুর হেসে বললো–আমি জানি দিপালী, তুমি আমাকে এ ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করতে পারবে এবং সেই ভরসা নিয়েই আমি তোমার কাছে এসেছি।

দিপালী লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে ছিলো, শুধু একবার বনহুরের দিকে দৃষ্টি তুলে পরক্ষণেই নামিয়ে নিলো। আজকাল সে আরও লজ্জাশীল হয়ে পড়েছে।

বনহুর বললো–চলি এখন?

না।

কেন

দিপালী প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালো।

বনহুর তাকিয়ে দেখলো দিপালীর চোখ দুটো ছলছল করছে।

হেসে বললো বনহুর–এখন প্রায়ই দেখা হবে তোমার সঙ্গে। আজ চলি দিপালী……

বনহুর বেরিয়ে যায়।

দিপালী দাঁড়িয়ে থাকে তার চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে নির্বাক হয়ে। বনহুরকে দিপালী আজ নতুন করে দেখেনি–দেখেছে বহুবার, তবু আরও দেখতে ইচ্ছা করে, আরও কিছু সময় যদি সে তার পাশে থাকতো তাহলে বড় ভাল লাগতো ওর।

দিপালী আঁচলে চোখ মুছে ফিরে তাকায় দেয়ালে টাঙ্গানো বনহুরের ছবিখানার দিকে।

*

দুর্গাদাস দাঁতে দাঁত পিষে বললো–আমার কবল থেকে শিকার ছিনিয়ে নিয়ে ভাল করেনি সে। আমাকে দুর্বল মনে করেছে বনহুর।

বনহুর! দস্যু বনহুর তোমার মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিয়েছে?

হাঁ মনিরাম, দস্যু বনহুর আমার মুখের গ্রাসই শুধু ছিনিয়ে নেয়নি, আমাকে সে কান্দাই ব্রীজ থেকে ভয়ঙ্কর জলোচ্ছাসের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিলো। ঐ মুহূর্তে

আমি যদি সম্মুখে লাইফবয় ল্যাম্পের চাকা না পেতাম তাহলে আমাকে মৃত্যুবরণ করতে হতো, এটা নির্ঘাৎ সত্য।

কান্দাই পর্বতের কোনো এক নির্জন স্থানে দুর্গাদাস ও তার প্রধান সহচর মনিরা মিলে কথা হচ্ছিলো। দস্যুরাণীর পিছু নিয়ে দুর্গাদাস সুদুর কান্দাই পর্যন্ত ছুটে এসেছে। সে গোপনে জানতে পেরেছিলো দস্যুরাণী এখন কান্দাই শহরে অবস্থান করছে এবং সেজন্যই সে তার আড্ডাখানা রায়হান পর্বতমালার গুপ্ত গুহা ত্যাগ করে ছুটে এসেছে, অবশ্য তার প্রধান আস্তানা মন্থনা দ্বীপে। কিছুকাল যাবৎ দুর্গাদাস দস্যুরাণীর সন্ধান বরণ করতে বাধ্য হয়েছিলো।

দুর্গাদাস তারই প্রতিশোধ নেবে এবং সেজন্যই কান্দাইয়ে তার আগমন। দুর্গাদাস সুচতুর, সে এসেই গোপনে স্থান করে নিয়েছে কান্দাই পর্বতমালার এক নির্ভুত জায়গায়, যেখানে সহসা কোনো মানুষ যায় না।

কিন্তু দুর্গাদাস যতই চতুর–বুদ্ধিমান হোক না কেন, দস্যু বনহুরের চোখে ফাঁকি দেওয়ার সাধ্য তার ছিলো না। কান্দাই পর্বতমালার গোপন স্থানে দুর্গাদাস আস্তানা গাড়তেই বনহুর এক কাঠুরিয়ার বেশে হাজির হয়েছিলো সেখানে।

দুর্গাদাস তাকে চিনতে পারেনি বরং গরিব কাঠুরিয়া মনে করে তাকে সহানুভূতি জানিয়ে প্রচুর টাকা দিয়ে বলেছিলো–এই টাকা নিয়ে চলে যা, খবরদার, আর কোনদিন এ পথে আসবি না।

বনহুর লম্বা সেলাম ঠুকে গদগদ কণ্ঠে বলেছিলো–আচ্ছা হুজুর, আর কোনোদিন এ পথ মাড়াবো না!

দুর্গাদাসের মতলব বুঝতে পেরেছিলো বনহুর, তখন সে চলে গেলেও আবার সে গোপনে এসেছিলো এবং আত্মগোপন করে লক্ষ্য করেছিলো তার কার্যকলাপ।

দুর্গাদাস কি অভিসন্ধি নিয়ে কান্দাই এসেছে, এটাই জানার জন্য উদগ্রীব ছিলো বনহুর এবং তা অল্প সময়েই জেনে নিতে সক্ষম হয়েছিলো সে। সেদিন দুর্গাদাস যখন দস্যুরাণীকে মঞ্চ থেকে চুরি করার অভিপ্রায় নিয়ে হলে এসে উপস্থিত হয়েছিলো, তখন দর্শকমহল থেকে লক্ষ্য করছিলো বনহুর সবকিছু।

মঞ্চে তখন মৃত্যুদৃশ্য দেখানো হচ্ছিলো।

কাপালিক বেশে দুর্গাদাস যখন মঞ্চে এসে হাজির হলো তখন আর কেউ না চিনলেও বনহুর তাকে চিনতে পেরেছিলো এবং লক্ষ্য করছিলো কি করে সে। কিন্তু বেশিক্ষণ বসতে হয়নি বা অপেক্ষা করতে হয়নি বনহুরকে, কাপালিকের বেশে দুর্গাদাস চন্দনাকে তুলে নিয়ে চলে গিয়েছিলো গ্রীনরুমের দিকে।

তখনই বনহুর আঁচ করে নিয়েছিলো দুর্গাদাস ভুল করলো এবং সে চন্দনাকে নিয়ে গ্রীনরুমে প্রবেশ না করে ওদিকে বাহির পথের দিকে অগ্রসর হয়েছে। আরও লক্ষ্য করলো, ঐ মুহূর্তে দস্যুরাণী বেরিয়ে গেলো কাপালিকবেশী দুর্গাদাসের পেছনে পেছনে।

বনহুর তাই এক দন্ড দেরী না করে বেরিয়ে গিয়েছিলো এবং অদূরে থেমে থাকা একটা গাড়িতে অকস্মাৎ চেপে বসে ষ্টার্ট দিয়েছিলো।

ততক্ষণে সামনের গাড়িখানাকে অনুসরণ করে দস্যুরাণীর তার নিজের গাড়িতে চেপে উল্কাবেগে গাড়ি চালনা করে চললো। সঙ্গে ছিলো তার কয়েকজন অনুচর।

অবশ্য ঐ মুহূর্তে বনহুর অজানা কোন এক গাড়ি নিয়ে দুর্গাদাসের গাড়িখানাকে ফলো করলো।

দস্যুরাণীর দৃষ্টিও এড়ায়নি, সে দেখলো অপর কোনো ব্যক্তি তাদের পেছনে এগিয়ে আসছে। দস্যুরাণী গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে সামনের গাড়িখানাকে ধরবার চেষ্টা করছিলো, তখন পিছনের গাড়িখানাকে নিয়ে ভাবার সময় তার ছিলো না। কিন্তু পিছনের গাড়িখানার চালক যখন তার সহচরী চন্দনাকে শত্রুর কবল থেকে রক্ষা করলো তখন দস্যুরাণী ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছিলো, কে ঐ মহাপুরুষ যে তার সহচরীকে রক্ষা করলো এবং শত্রুকে গভীর জলোচ্ছাসে নিক্ষেপ করলো?

সতর্কভাবে দস্যুরাণী লক্ষ্য করলেও সেই মহাপুরুষকে চিনতে পারলো না তবে সেই গাড়ির নম্বর সে মনে রেখেছিলো এবং খুঁজে বের করেছিলো গাড়ির মালিককে।

ভদ্রলোকের নাম নোমান, এ কথাও জেনে নিয়েছিলো দস্যুরাণী এবং তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলো হোটলের ক্যাবিনে গিয়ে।

দুর্গাদাস ভয়ঙ্কর জলোচ্ছাসে নিক্ষিপ্ত হয়ে প্রথমে তলিয়ে গিয়েছিলো গভীর জলে। ভাগ্য তার প্রসন্ন বলতে হবে তাই সে তলিয়ে গিয়েও হাতের কাছে হাতড়ে পেয়েছিলো লাইফবয় ল্যাম্পের চাকা, তাই ধরে সে ভেসে উঠেছিলো উপরে এবং সাঁতার কেটে লাইফবয় ল্যান্সহ তীরের দিকে এগিয়ে আসছিলো, এমন সময় কোনো একটা ছোট ডিঙ্গি তাকে উদ্ধার করে নেয় এবং তীরে পৌঁছে দেয়।

দুর্গাদাস জীবনে রক্ষা পেয়েও তার শরীর বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলো, কারণ জলোচ্ছাসের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছিলো ভীষণভাবে। কান্দাই আস্তানায় পৌঁছে মনিরামের সঙ্গে পরামর্শ করে নেয় কেমনভাবে আবার সে কাজে নামবে এবং দস্যু বনহুর যে তাকে এভাবে নাকানি চুবানি খাইয়েছে তাও সে বুঝতে পেরেছিলো। রাগে ফেটে পড়ছিলো দুর্গাদাস, বনহুরই যে তাকে এভাবে জব্দ করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এছাড়াও কারও সাধ্য ছিলো না তাকে কাহিল করে তার মুখের গ্রাস কেড়ে নেয়।

দস্যু বনহুর চন্দনাকে উদ্ধার করে ফিরিয়ে দিয়েছে দস্যুরাণীর কাছে। সে জানতো দুর্গাদাসের কবলে পড়ে মেয়েটার দুরবস্থা হবে, তাই সে এ ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে এগিয়ে এসেছিলো।

দুর্গাদাস এখন অনেকটা সুস্থ, জলোচ্ছাসে নিক্ষিপ্ত হয়ে কাহিল হয়ে পড়েছিলো, তাই সে নিশ্চুপ ছিলো, কদিন। বললো দুর্গাদাসমনিরাম, এখন দস্যুরাণীই শুধু আমার শিকার নয়, আমি দস্যু বনহুরকেও দেখে নেবো এবং আমি তার জন্য প্রস্তুত আছি।

মনিরার বললো–হাঁ, আমি তোমাকে সহায়তা করবো।

দস্যুরাণীর শত্রু এই দুই মহানায়ক মিলে যখন কথা হচ্ছিলো, ঐ মুহূর্তে সেই কাঠুরিয়া হাজির হলো সেখানে।

চমকে উঠলো দুর্গাদাস, বললো সে–এ্যা, তুই আবার এসেছিস?

কাঠুরিয়া বললো–হুজুর, পথ ভুল করে আবার চলে এসেছি!

দুর্গাদাস হুঙ্কার ছাড়ালোতোকে আমি প্রচুর অর্থ দিলাম তবু তুই পথ ভুল করলি? তোকে খতম না করে ছাড়বো না……

লাভ–লোকসান তুই বুঝবি না। আয় আমার সঙ্গে, তোকে দেখাচ্ছি মজাটা……

হুজুর, মাফ করে দেন, আর কোনোদিন এমন ভুল হবে না। মাফ করে দেন হুজুর……কাঠুরিয়া দু'হাত জোড় করে ক্ষমা ভিক্ষা চাইলো।

মনিরাম বললো–ওরা গরিব মানুষ, পেটের দায়ে বনে আসে। হয়তো তোমাকে কথা দিয়ে তা রক্ষা করতে পারেনি। দাও দুর্গাদাস, ওকে এবারের মত ক্ষমা করে দাও।

দুর্গাদাস অতি কষ্টে এবার ক্ষমা করতে রাজি হলো কিন্তু তার কথা যদি কাউকে কাঠুরিয়া বলে দেয় তার পরিণাম হবে ভয়ঙ্কর, তাও জানিয়ে দিলো দুর্গাদাস।

কাঠুরিয়া চলে গেলো নাক–কানে খৎ দিয়ে, আর কোনোদিন সে এ মুখো হবে না বলে শপথ করলো। কিন্তু যাবার পর দুর্গাদাস কুড়িয়ে পেলো একটা চিঠি।

ভাজকরা এক টুকরো কাগজ।

অবশ্য কাগজের টুকরোখানা মনিরামই কুড়িয়ে হাতে দিলো দুর্গাদাসের, দিয়ে বললো–দেখো তো এই নির্জন পর্বতমালার গোপন স্থানে কি করে এ ভাজকরা কাগজখানা এলো?

দুর্গাদাস ভাজকরা কাগজখানা নিয়ে মেলে ধরলো চোখের সামনে, সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলোদস্যু বনহুর! দস্যু বনহুর এসেছিলো এখানে!

বলো কি দুর্গাদাস?

হাঁ মনিরাম! এই চিরকুটখানা পড়ে দেখো।

তুমিই পড়?

দুর্গাদাস পড়তে শুরু করলো?

দুর্গাদাস, দস্যুরাণী তোমার শিকার হতে পারে, তাই বলে তুমি কান্দাইয়ের বুকে বসে তার কোনো ক্ষতি সাধন করে, এ আমি বরদাস্ত করবো না। তার সঙ্গে

তোমার মোকাবেলা হবে রায় হানে। তুমি অচিরে ফিরে যাও, নচেৎ কঠিন শাস্তি পাবে।

—দস্যু বনহুর

মনিরামের চোখ দুটো জ্বলে উঠলো, বললো–দস্যু বনহুর এখানে এসেছিলো? এবং সে তোমাকে শাসিয়ে গেছে……এত স্পর্ধা তার…….

হাঁ মনিরাম, এ কাঠুরিয়াই দস্যু বনহুর।

বল কি দুর্গাদাস।

হাঁ, সে নিজে এসে আমাদের অবস্থান জায়গা দেখে গেলো তবে এই তার প্রথম নয়, দ্বিতীয় বারের অভিযান। আমি নির্বোধ, তাই তাকে চিনতে ভুল করেছি কিন্তু এবার এলে তাকে দেখে নেবো কেমন শক্তিশালী সে। মনিরাম?

বলো দুর্গাদাস?

দস্যু বনহুর আমাকে যেভাবে সেদিন জলোচ্ছাসের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিলো তাতে আমার মৃত্যু অনিবার্য ছিলো। কিন্তু আমি ভাগ্যক্রমে জীবনে বেঁচে গেছি……দাঁতে দাঁত পিষে বললো দুর্গাদাস– আমি যদি তাকে কোনো ক্রমে চিনতে পারতাম তাহলে জীবন নিয়ে সে এই স্থান ত্যাগ করতে পারতো না।

এখানে যখন দুর্গাদাস ও মনিরাম বনহুরকে নিয়ে আলোচনা চালাচ্ছিলো তখন বনহুর তাজের পিঠে চেপে ফিরে চলেছে তার আস্তানা অভিমুখে।

এমন সময় হঠাৎ তার দৃষ্টি চলে গেলো পথের একপাশে, রক্তাক্ত একটা দেহ পড়ে আছে পথের

বনহুর তাজের পিঠ থেকে নেমে দাঁড়ালো।

বনহুরের দেহে তখনও কাঠুরিয়ার পোশাক ছিলো। ঢিলা ছেঁড়া পাজামা, গায়ে ঢিলা ময়লা পাঞ্জাবী। একটা কুঠারও ছিলো তার সঙ্গে।

বনহুর অশ্বপৃষ্ঠ ত্যাগ করে নেমে এগিয়ে গেলো মৃতদেহটার পাশে। উবু হয়ে লাশটা পরীক্ষা করতেই চমকে উঠলো, এ যে ঐ ধরনের হত্যাকান্ড যে হত্যাকান্ড

সংঘটিত হয়েছে দস্যুরাণীর গ্রীনরুমে! অবাক হয়ে দেখছে বনহুর–আশ্চর্য বটে, নিহত ব্যক্তির বুক চিরে কলিজা ও হৃৎপিন্ড বের করে নিয়ে ভক্ষণ করেছে কোনো হিংস্র প্রাণী। তখনও লোকটার বুকের ভিতরের তাজা রক্ত জমট বেঁধে উঠেনি। হয়তো বা কয়েক মিনিট পূর্বে লোকটাকে হত্যা করা হয়েছে।

বনহুরের ভ্রূকুঞ্চিত হলো, কিছুক্ষণ মৃতদেহটার দিকে তাকিয়ে ভাবলো, তারপর উঠে দাঁড়ালো, অস্ফুট কণ্ঠে বললোহতভাগ্য ব্যক্তি, না জানি কে, কি নাম এর কে জানে!

অশ্বপৃষ্ঠে উঠে বসলো বনহুর।

*

দস্যু বনহুরই এই হত্যাকান্ডের অধিনায়ক, এ কথা আপনি কেমন করে অনুমান করলেন মিঃ হুসাইন? মিঃ লোদী জিজ্ঞাসা করলেন মিঃ হুসাইনকে।

মিঃ হুসাইন বললেন স্যার, এমন নৃশংস হত্যাকান্ড একমাত্র দস্যু বনহুরই সংঘটিত করতে পারে…

গভীরভাবে কিছু চিন্তা করে একমুখ ধোয়া ছাড়লেন মিঃ লোদী, তারপর সোফায় সোজা হয়ে বসে বললেন–ইতি পূর্বে কান্দাই শহরে এরূপ নৃশংস হত্যাকান্ড আরও কয়েকবার ঘটেছে এবং প্রথমে সবার সন্দেহ হয়েছে দস্যু বনহুরই এ হত্যাকান্ডের মূল কিন্তু পরে সন্ধান নিয়ে জানা গেছে দস্যু বনহুর ঐ সব হত্যাকান্ডের নায়ক নয়।

তাহলে কি স্যার আপনি মনে করেন এই অদ্ভুত হত্যাকান্ডের মূলে দস্যু বনহুর নেই?

হাঁ, আমার ঐ রকম মনে হয় মিঃ হুসাইন। মনে হয়, এই হত্যাকান্ড কোনো জন্তুর দ্বারা সংঘটিত হয়ে চলেছে। সেদিন নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠানে গ্রীনরুমে নৃশংস হত্যাকাণ্ড, তারপর কান্দাই পর্বতের অদূরে বনের মধ্যে মৃতদেহ পাওয়া গেছে, সেটাও ঐভাবে নিহত হয়েছে, তারপর আবার গতকাল শহরের এক গলির মধ্যে এক বিকৃত নরদেহ……

স্যার, আজকেও একটা মৃতদেহ পাওয়া গেছে এক হোটেলের পাশে। কথাটা বলতে বলতে মিঃ লোদীর সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন মিঃ হামিদ।

পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ হামিদের চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠেছে। তিনি কথাগুলো বলে তাকালেন মিঃ লোদী এবং মিঃ হুসাইনের মুখের দিকে।

মিঃ লোদী বললেন–বলেন কি, আজকেও আবার সেই হত্যাকান্ড?

হা স্যার, সেকি ভয়াবহ নৃশংস হত্যাকান্ড। আমি সেখান থেকেই আসছি স্যার।

মিঃ হুসাইন বললেন–আশ্চর্য ব্যাপার, এখন দেখছি রোজ এই হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়ে চলেছে।

মিঃ লোদী বললেন–কান্দাই শহরে এই ধরনের রহস্যময় হত্যাকান্ড আজ আর কাল শুধু নয়, আরও বহুবার এই রকম নানা ধরনের রহস্যময় হত্যাকান্ড ঘটেছে কিন্তু এই হত্যাকান্ডা আগের চেয়েও রহস্যপূর্ণ বলে আমার মনে হচ্ছে।

স্যার, আপনি ঠিক বলছেন–এমন ধরনের অদ্ভুত হত্যারহস্য কোনো মানুষ দ্বারা সংঘটিত হতে পারে না।

আমারও তাই মনে হয় কিন্তু সে জন্তুটা কেমন দেখতে বা কি তার নাম, তা ছাড়া কোথায় তার বাস, সব যেন রহস্যজালে আবৃত। থামলেন মিঃ লোদী।

মিঃ হুসাইন তাকালেন মিঃ হামিদের দিকে, তার চোখমুখের ভীতিজনক ভাব দেখে বলছেন–আপনি কি স্বচক্ষে মৃতদেহটা দেখেছেন মিঃ হামিদ?

হাঁ এবং এমন মৃতদেহ আমি পূর্বে দেখিনি। কথাগুলো বলতে বলতে কেমন যেন নিষ্প্রভ হয়ে উঠলো তার মুখমন্ডল, একটা ঢোক গিলে বললেন–কি মর্মান্তিক দৃশ্য!

মিঃ হুসাইন বললেন–আপনি এই প্রথম দেখেছেন তাই এত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। এর পূর্বে যে হত্যাকান্ডগুলো সংঘটিত হয়েছে তাও ছিলো এই একই ধরনের।

এমন সময় ফোন বেজে উঠলো।

রিসিভার তুলে নিলেন মিঃ লোদী–হ্যালো,–আমি লোদী বলছি……।

ওপাশ থেকে ভেসে এলো অপরিচিত কণ্ঠস্বর……মিঃ লোদী, আপনি দক্ষ পুলিশ সুপার জানি কিন্তু আপনার কাজ সূক্ষ্ম নও তাও জানি, নাহলে আজও আপনি নিশ্চুপ থাকতে পারতেন না……

মিঃ লোদীর গাম্ভীর্যপূর্ণ বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর…..শহরের আনাচে কানাচে অবিরত এধরনের নৃশংস হত্যাকান্ড প্রতিদিন সংঘটিত হয়ে চলেছে অথচ পুলিশমহল কিছু করতে পারছে না, এটা আপনাদের প্রশংসনীয় সংবাদ নয়……কাজেই বলছি মনোযোগ সহকারে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে কাজ করুন যেন আর এমন মর্মান্তিক বা দুঃখজনক হত্যাকান্ড সংঘটিত না হয়।

…আপনার পরিচয় বলুন, তারপর আপনার বক্তব্য পেশ করুন……বলুন আপনি কে……

……আমি যেই হই না কেন, আপনাদের হিতাকাতক্ষী মনে রাখবেন এবং এই হত্যাকান্ড ব্যাপারে আমি আপনাদের সহায়তা করতে রাজি আছি……।

…..আপনি কে এবং কোথা থেকে বলছেন আর এই অদ্ভুত হত্যাকান্ড ব্যাপারে আপনি আমাদের কি করে সহায়তা করবেন, সব খুলে বলুন……

…..আজ এই মুহূর্তে আপনার সবগুলো প্রশ্নে উত্তর আমি দিতে রাজি নই, তবে জেনে রাখুন এই হত্যাকান্ড ব্যাপারে আপনাদের কোনোরকম অবহেলা আমি বরদাস্ত করবো না…….

কে, কে বললো আমরা এই রহস্যপূর্ণ হত্যাকান্ড ব্যাপারে অবহেলা করছি…… বরং আমরা পুলিশমহল যারপর নাই উদ্বিগ্ন হয়ে তল্লাশি চালিয়ে চলেছি…… আর মনে রাখবেন আমরা পুলিশমহল কারও সহায়তা কামনা করি না..

……বেশ, আপনার কথা শুনে খুশি হলাম মিঃ লোদী, কারও সহায়তা কামনা না করে আপনারা যদি এই হত্যাকান্ডের সমাধান করতে পারেন তাহলে আমি আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাবো……ওপাশে রিসিভার রাখার শব্দ হলো।

মিঃ লোদী রিসিভার রেখে অন্যান্য পুলিশ অফিসারকে লক্ষ্য করে বললেন– এই মুহূর্তে কোনো এক অপরিচিত ব্যক্তি ফোন করেছিলো। সে আমাদের কাজে

সন্তুষ্ট নয়। এই হত্যাকান্ডের ব্যাপারে সে আমাদের সহায়তা করতে আগ্রহী।

বলেন কি স্যার, কোনো এক অপরিচিত ব্যক্তি এই হত্যারহস্য ব্যাপারে পুলিশমহলকে সহায়তা করতে আগ্রহী? বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন মিঃ হুসাইন।

মিঃ লোদীর মুখমন্ডলে একটা গভীর চিন্তার ছাপ ফুটে উঠেছে, বললেন–হাঁ, শুধু সহায়তা করতেই আগ্রহী নয়, সে আরও বলেছে পুলিশমহল যদি এ কাজে সফলতা লাভ করে তাহলে সে পুলিশমহলকে ধন্যবাদ জানাবে।

বললেন মিঃ হামিদ–স্যার, নিশ্চয়ই কোনো দুষ্টলোক, নইলে এভাবে পুলিশ অফিসে ফোন করতে সাহসী হতো না।

দুষ্টলোক কিনা জানি না, তবে তার গলার স্বরে মনে হলো লোকটা সাধারণ লোক নয়……তার কণ্ঠে ছিলো এমন একটা ব্যক্তিত্ব যা অবহেলা করার যায় না।

স্যার, আমাদের মনে হয় নিশ্চয়ই সে কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে ফোন করেছিলো কিন্তু কি উদ্দেশ্য তা বোঝা মুশকিল।

হাঁ, মিঃ হুসাইন, আমি জানতে চেয়েছিলাম তার পরিচয় এবং তার উদ্দেশ্য কিন্তু সে তার কোনো জবাব দেয়নি। তবে মনে হয় আবার সে ফোন করবে অথবা তার সাক্ষাৎলাভও ঘটতে পারে! সে যেই হোক আমরা যদি তার কাছে এই হত্যারহস্য ব্যাপারে সহায়তা পাই তাহলে মন্দ কি। কথাগুলো বলে মিঃ লোদী নতুন একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলেন।

ঐ অজ্ঞাত ব্যক্তির ফোন এসেছিলো পুলিশ অফিসে কিন্তু এ সংবাদটা ছড়িয়ে পড়লো সমস্ত শহরময়, বিশেষ করে পুলিশমহলে, তারপর জনসাধারণের মধ্যে।

এক সপ্তাহে পাঁচটি হত্যাকান্ড কম কথা নয়। ভীষণ এক আতঙ্কের ছায়া পড়লো সবার মনে। কে কিভাবে নিজ নিজ পরিবারকে সাবধানে এবং নিরাপদে রাখবে, এ নিয়ে সবাই চিন্তিত হয়ে পড়লো।

দস্যুরাণী নিজেও চিন্তিত হয়ে পড়েছে, এমন অদ্ভুত কান্ড সেও দেখেনি ইতিপূর্বে। চন্দনার মনেও শান্তি নেই, তার পুরো সন্দেহ একাজ দস্যু বনহুরেরই। দস্যু বনহুর ছাড়া এমন হৃদয়হীন কাজ কেউ করতে পারে না। তবে কি তার

উদ্দেশ্য, কেন সে এমনভাবে নিরীহ ব্যক্তিদের বুক চিরে কলিজা সহ হৃৎপিন্ড ছিঁড়ে বের করে নিচ্ছে, এ প্রশ্নের জবাব তারা আবিস্কারে সক্ষম হলো না।

অবশ্য দস্যুরাণী এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চুপ, যে উদ্দেশ্য নিয়ে কান্দাই তার আগমন সে উদ্দেশ্য সফল হয়নি, হবেও না, কারণ দস্যু বনহুরকে কোনোক্রমে সে হাতের মুঠায় আনতে পারছে না।

দস্যুরাণীর মন প্রসন্ন নয়, অর্থোপোর্জন তার উদ্দেশ্য ছিলো না। তবু হাতে এসেছে প্রচুর অর্থ। এত অর্থ পাবে আশা করেনি সে।

*

দস্যু বনহুর বলেছে, অর্থ তাকে কান্দাই থেকে নিয়ে যেতে দেবে না কিন্তু দস্যুরাণীর জেদ সে ঐ অর্থ নিয়ে না ফিরবে না।

অবশ্য এই অদ্ভুত হত্যাকান্ড সম্পর্কে দস্যুরাণীর মনে ছিলো জানার বাসনা এবং সেও চায় এর উদঘাটন কিন্তু কোনো ফল হচ্ছে না। দীর্ঘদিন ধরে কান্দাই থাকার পরও এর কোনো কুল–কিনারা করতে পারলো না দস্যুরাণী। পুলিশমহল জোর তদন্ত চালিয়ে চলেছে, সন্দেহ করে কয়েক ব্যক্তিকে পুলিশমহল গ্রেপ্তার করেছে কিন্তু আসলে তারা দোষী নয়, এটা দস্যুরাণী জামে বা বুঝতে পেরেছে।

দস্যুরাণী নিজেও অনুসন্ধান চালিয়েছে কিন্তু কোনো ফল পাচ্ছে না। সে বুঝতে পেরেছে এ কাজ কোনো অমানুষের কিন্তু কে সে?

চন্দনা যেন দিন দিন ক্রমেই হাঁপিয়ে উঠেছে। দস্যুরাণীকে নির্বাক থাকতে দেখে তার মনে রাগ হচ্ছে। কেন রাণী যেতে চায় না, সে তো বেশ বুঝতে পেরেছে কান্দাই আসাটা তার সম্পূর্ণ বৃথা। তাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। এক সময় দস্যুরাণীকে বললো চন্দনারাণী, অহেতুক এই বিলম্বের কোনো কারণ দেখছি না, চলো ফিরে যাই আস্তানায়?

মৃদু হেসে বললো দস্যুরাণী–এরই মধ্যে দস্যু বনহুরকে পাকড়াও করার সাধ মিটে গেলো?

চন্দনা লজ্জিত কণ্ঠে বললো–সব চেষ্টা আমাদের ব্যর্থ হলো রাণী!

দস্যুরাণী বললো–না, ব্যর্থ আমি হইনি চন্দনা। শোন কথা আছে তোর সঙ্গে।

বলো?

এই হত্যাকান্ডের সন্ধানে পুলিশমহল এখন ব্যস্ত আছে। শুধু পুলিশমহল নয়, সমস্ত কান্দাইবাসী এখন উদ্বিগ্ন আছে। এই তো সুযোগ! যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা কান্দাই এসেছিলাম তা পূর্ণ হবে বলে আমি আশা করছি।

রাণী!

হাঁ, চন্দনা।

কি করে তা সম্ভব বলো?

এখন নয়, পরে বলবো।

না, তোমাকে বলতে হবে এবং তা এক্ষুণি।

শোন্ চন্দনা।

বলো, আমি কান পেতে রয়েছি।

দস্যুরাণী সোফায় হেলান দিয়ে বসেছিলো, এবার সে সোফা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো এবং পায়চারী। করতে করতে বললো–আমি জানি দস্যু বনহুর আমাদের উপকার করছে।

উপকার করেছে দস্যু বনহুর, বলো কি রাণী?

হা এবং অশেষ উপকার যাকে বলে।

তাই নাকি?

বললাম তো হাঁ!

তোমার কথা শুনে হাসি পাচ্ছে আমার।

দস্যুরাণী তেমনি গম্ভীর স্বরে বললো–দস্যু বনহুরকে আমি আটক করতে চাই এবং তাকে আমি সায়েস্তা করতে চাই, এসব জেনেও সে আমাদের উপকার করে চলেছে.......

এ কথা আমার বিশ্বাস হয় না রাণী।

অবিশ্বাসের কিছু নেই, কারণ সে আমাদের উপকার করে আমাকে অপমানিত করে যাচ্ছে।

উপকার করে তোমাকে অপমানিত করছে সে।

হাঁ চন্দনা। একটু থেমে বললো দস্যুরাণী–চন্দনা, আমি জানতে পেরেছি মিঃ নোমান তোর উদ্ধারকারী নয়...

তবে...তবে কে সেদিন আমাকে......

ঐ দস্যু বনহুর তোকে সেদিন.....

কি বলছো রাণী!

হাঁ, ঠিক বলছি।

না, আমি বিশ্বাস করি না।

আমি সন্ধান নিয়ে জেনেছি স্বয়ং দস্যু বনহুর সেদিন আমাদের সামনের গাড়িখানাকে অনুসরণ করে এগিয়ে এসেছিলো এবং নরপশু শয়তানটাকে কাহিল করে তোকে উদ্ধার করেছিলো.......

মিথ্যা কথা।

না, সম্পূর্ণ সত্য।

তাহলে....

বললাম তো এটা তার সহানুভূতি বা দয়া। দস্যু বনহুর আমাদের দয়া দেখাতে চায় এবং সে কারণেই সে এগিয়ে এসেছিলো সেদিন আমরা তার শত্রু জেনেও,

বুঝলি?

চন্দনার চোখেমুখে বিস্ময় ভাব ফুটে উঠেছে। ঢোঁক গিলে বললে সেতুমি না বলেছিলে মিঃ নোমান নামে এক ব্যক্তি সেদিন আমাকে দুস্কৃতিকারীর কবল থেকে রক্ষা করেছে

হাঁ, আমি তাই জানতাম কিন্তু সন্ধান নিয়ে সব জেনেছি। আসলে নোমানের গাড়ি নিয়ে দস্যু বনহুরই সেদিন……যা সে কথা, এবার শোন্।

বলো?

আমি জানতে পেরেছি বনহুর নাকি আজ রাতে তার কোনো এক ভক্তের সঙ্গে দেখা করার জন্য তার বাসস্থানে আসবে। কৌশলে তাকে হাত করতে হবে এবং তারপর…বুঝলি? চন্দনা, তৈরি হয়ে নে, এক্ষুণি বেরুবো……

চন্দনার মনে নতুন এক উৎসাহ দেখা দিলো, দস্যু বনহুর যদিও তাকে বিপদ মুহূর্তে উদ্ধার করেছিলো তবু তার মনে লুকিয়ে আছে প্রতিহিংসার আগুন। বনহুর তার রাণীর শত্রুই শুধু নয়, সে রাণীর অতিকষ্টে সংগ্রহ করা রক্তে আঁকা ম্যাপ আত্নসাৎ করার জন্য সদা প্রস্তুত, তাই চন্দনা তার বিরুদ্ধাচরণ করতে পিছপা নয়।

চন্দনা অল্পক্ষণে তৈরি হয়ে চলে এলো।

নিখুঁত পুরুষের পোশাক তার শরীরে।

দস্যুরাণীও পুরুষের ড্রেসে সজ্জিত হয়েছে, সহসা দেখলে কেউ চিনতেই পারবে না, ভাববে কোনো এক যুবক।

চন্দনা দস্যুরাণীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত লক্ষ করে মৃদু হেসে বললো–চমৎকার।

হু, তোরও ছদ্মবেশ চমৎকার হয়েছে চন্দনা।

হাঁ, বলল এবার কি করতে হবে?

দস্যুরাণী রিভলভার প্যান্টের ভিতরের গোপন পকেটে রেখে বললো–চল।

চন্দনা বললো–কোথায় যেতে হবে বলো!

দস্যুরাণী আর চন্দনা সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো নিচে।

সিঁড়ির অদূরে গাড়ি অপেক্ষা করছিলো।

দস্যুরাণী আর চন্দনা নিচে নেমে আসতেই ড্রাইভার গাড়ির পিছন আসনের দরজা খুলে ধরলো।

দস্যুরাণী আর চন্দনা গাড়িতে চেপে বসলো।

ড্রাইভার এবার ড্রাইভ আসনে উঠে বসলো।

দস্যুরাণী বললো–হীরামন কলোনীতে চলো।

আচ্ছা! বললো ড্রাইভার এবং সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ছাড়লো সে।

গাড়িখানা এবার রাজপথ ধরে উল্কাবেগে ছুটে চললো। হীরামন কলোনীতে পৌঁছতে যে পথ অতিক্রম করতে হবে তা বেশ নির্জন পথ। পথের একপাশে ছোট্ট ছোট্ট দোকানপাট এবং রেষ্টুরেন্ট। অপরপাশে দু'চারটে পুরোন দালানকোঠা পোড়োবাড়ি। এগুলো পার হলেই হীরামন কলোনী। এখানে বসবাস করে যারা– তারা নিতান্ত গরিব।

বেশিরভাগ মজুর আর খালাসি এবং টাঙ্গাওয়ালা। এরা শহর ছেড়ে এই নির্জন এলাকায় বসবাস করে, এখানে তাদের নেই কোনো বাধাবিঘ্ন–ইচ্ছামত কাজ করে, খায়দায়, বিশ্রাম করে, আমোদ–আহ্লাদ করে। তবে বেশির ভাগ সময় এদের কাটে দুঃখ–কষ্টে, ব্যথা–বেদনায়।

রোগ–শোক মহামারী হীরামন কলোনীতে লেগেই থাকে এবং মাসে এ কলোনীতে দু'চারজন যে মরছে না তা নয়। প্রায়ই মানুষ মরছে তবু নিয়মের ব্যতিক্রম নেই। সকালে উঠে কেউ হাতমুখ ঘোয়, কেউ ধোয় না। কলতলায় ভীড় জমে যায়, তাই অনেকেই কলতালায় না গিয়ে পান্তাভাতের গামলা নিয়ে খেতে বসে যায়, এমনি হাতখানাও ধোয়া হয় না কখনও কখনও পানির অভাবে। চারটা নাকেমুখে গুঁজে বের হয় কাজে কেউ কলকারখানায় কেউ বা টাঙা নিয়ে ভাড়া খাটতে।

হয়তো কখনও সুস্থ শরীরে ফিরে আসে, আবার হয়তো কখনও ফিরে আসে অসুখ নিয়ে। ডাক্তার দেখানো হয়ে উঠে না, তাই অসুখ বেশি হয়ে পরপারে যাত্রা করে। কাউকে এরা দোষ দেয় না বা দেবার প্রয়োজন মনে করে না। সব এরা ভাগ্যের লিখন বলে মেনে নেয়।

বনহুর তাই চুপ থাকতে পারেনি এই হীরামন কলোনীর মানুষগুলোর অবস্থা লক্ষ্য করে। অবশ্য আজ নতুন নয়, বহুদিন ধরে হীরামন কলোনীর মানুষগুলো বনহুরের সাহায্য পেয়ে আসছে। মাঝে–মধ্যে বনহুর স্বয়ং এসে হাজির হয় এই কলোনীতে! সবার অবস্থা সে নিজ চোখে দেখে এবং নিজ কানে শোন। ইচ্ছামত পকেট থেকে টাকা বের করে যার যা প্রয়োজন দেয় সে উজাড় করে।

বনহুরের দয়ার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে বেঁচেছিলো কয়েকটা পরিবার।

তাদের সংসারে ছিলো না উপার্জনশীল কোন মানুষ তাই তারা বড় অসহায়। বনহুর তাই প্রায়ই এদের দেখাশোনা করতে আসতো এবং এদের মধ্যে সাহায্য বিতরণ করে যেতে। যেন এদের কোনো অসুবিধা না হয়।

কথাটা কোনোক্রমে জানতে পারে দস্যুরাণী।

তবে বেশি কিছু নয়, হোটেলের কোনো এক বয় কথার মধ্যে বলে বসেছিলো হীরামন কলোনীতে তার বাসা। বাপ–মা খুব গরিব, সেও এতদিন খুব ছোট ছিলো তাই তাদের খুব দুঃখ। রাণী তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলো, কি করে এতদিন তাদের চলেছে। বয় বলেছিলো, এক মহৎ ব্যক্তি তাদের সাহায্য করেন এবং তার দয়ায় তারা আজও বেঁচে আছে। শুধু তারা নয়, হীরামন কলোনীর প্রায় সবাই উপকৃত তার কাছে।

দস্যুরাণীর মনে এটা নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিলো। গভীরভাবে কিছুক্ষণ চিন্তা করে গিয়ে বলেছিলোলোকটা বড় মহৎ, নইলে এমন উপকার করে। আচ্ছা, সে কি রোজ আসে তোমাদের হীরামন কলোনীতে।

বলেছিলো বয়–না, বোজ সে আসে না–তবে অমাবস্যা রাতে সে একটা জমকালো অশ্বপৃষ্ঠে চেপে আমাদের হীরামন কলোনীতে আসে। আগ্রহভরে আরও বলেছিলো বয়– তার অশ্বখুরের শব্দ শুনলে আমরা আনন্দে অধীন হয়ে উঠি। কলোনীর সবার মুখে হাসি ফোটে তখন.......

দস্যুরাণীর চোখ দুটো জ্বলে উঠেছিলো মুহূর্তের জন্য। একটু চুপ থেকে বলেছিলো সে–সত্যি বলছো?

হাঁ, মা জী, সত্যি বলছি।

আমাকে দেখাতে পারো তাকে

খুব পারি, তবে হীরামন কলোনীতে যেতে হবে। আপনি যাবেন তো?

যাবো কিন্তু আমাকে দেখলে সে যদি রাগ করে, কারণ আমি তো আর হীরামন কলোনীর লোক নই।

বয় চিন্তিত কণ্ঠে বলেছিলো–তাই তো, আপনি গেলে ঠিক রাগ করতে পারে সে।

তাহলে এ কাজ করলে কেমন হয়? বলেছিলো দস্যুরাণী।

বলুন কি কাজ করলে ভাল হয়?

আমরা পুরুষের পোশাক পরে যাবো তোমাদের হীরামন কলোনীতে। তোমাদের কলোনী দেখাই হলো আমাদের মূল উদ্দেশ্য এবং এ কারণেই যাবো।

যেদিন অমাবস্যা হবে নিশ্চয়ই দেখতে পাবেন তাকে।

হাঁ, আমরা অমাবস্যার দিনই যাবো।

তাই করেছে দস্যুরাণী।

আজ অমাবস্যা। নিশ্চয়ই আজ রাতে সে হীরামন কলোনীতে আসবে।

গাড়ি এক সময় হীরামন কলোনীতে পৌঁছে গেলো। বয় ছোকরা আগে থেকে অপেক্ষা করছিলো, সেখানে গাড়ি পৌঁছতে এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানালো দস্যুরাণী আর চন্দনাকে।

কলোনীর অনেকেই এগিয়ে এলো, দু'জন অপরিচিত লোককে দেখে তারা ঘিরে ধরলো সবাই মিলে। দস্যুরাণী তাদের অবস্থা দেখে নিজ হাতে প্রচুর অর্থ

তাদের মধ্যে দান করলো।

হীরামন কলোনীর বাসিন্দা গরিব বেচারি খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠলো। তারা জানে তাদের সাহায্যকারী ঐ এক ব্যক্তি যে তাদের ব্যথায় ব্যথিত হয় এবং দু'হাতে উজাড় করে দান করে।

সবাই উন্মুখ হয়ে আছে কখন আসবে সে।

রাত বাড়ছে।

দস্যুরাণী আর চন্দনা পায়চারী করে চলেছে।

দস্যুরাণী শুধু আসেনি, হীরামন কলোনীর চারপাশে আছে দস্যুরাণীর সশস্ত্র অনুচর। দস্যুরাণীর বাঁশির শব্দ শোনামাত্র তারা বেরিয়ে আসবে এবং আক্রমণ করবে দস্যু বনহুরকে। নিশ্চয়ই দস্যু বনহুর এখানে প্রস্তুত হয়ে আসবে না, সে আসবে দান করতে যুদ্ধ করতে নয়, কাজেই এটাই একটা মহা সুযোগ।

কিন্তু প্রহরের পর প্রহর গাড়িয়ে চলে, আসে না সে। দস্যুরাণী আর চন্দনা হাপিয়ে উঠে।

হঠাৎ দস্যুরাণী জানতে পারে কলোনীর দুঃস্থ পরিবার, তাদের সাহায্য পেয়ে গেছে। একটু পূর্বে সে। এসেছিলো এবং তাদের মধ্যে প্রয়োজনমত অর্থ দিয়েছে।

কথাটা শুনে হতবাক হলো দস্যুরাণী এবং চন্দনা। এমনকি ছোকরা বয়ও জানে না কখন কোন্ পথে সেই মহান মহৎ ব্যক্তি এসেছিলো কলোনীতে।

যাকে জিজ্ঞাসা করলো সেই বললো, এইমাত্র আমাদের টাকা দিয়ে গেলো। বেশিদূর যান নি, হয়তো অপর কোন ঘরে টাকা দিচ্ছে সে......আবার যাকে জিজ্ঞাসা করলো সে বললো টাকা আমরা পেয়েছি একটু আগেই সে এসেছিলো। আমাদের পরম বন্ধু সে, তাকে না পেলে আমরা মরে যেতাম।

এক বৃদ্ধের হাতের মুঠায় তখনও টাকার গাদা ধরা আছে। যুবকের বেশে দস্যুরাণী আর চন্দনা উপস্থিত হতেই বৃদ্ধ বললো যাকে দেখবে বলে তোমরা এসেছে সে তো এইমাত্র চলে গেলো। বেশি দূর যায় নি, এসো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি.....বৃদ্ধ এগুলো।

দস্যুরাণী আর চন্দনা তাকে অনুসরণ করলো।

রাত এখন বেশ বেড়ে গেছে।

শহরে ফিরবার জন্য ড্রাইভার বারবার তাগাদা দিচ্ছে। দস্যু রাণী আর চন্দনা বলছে, আর একটু পরেই তারা রওনা দেবে।

ড্রাইভার অপেক্ষা করছে গাড়িতে বসে বসে।

বৃদ্ধ এগিয়ে গেলো বটে কিন্তু সেই দানশীল ব্যক্তির সন্ধান আর পেলো না। বৃদ্ধের হাতে ছিলো কেরোসিনের ডিবা দপ দপ্ করে আলো জ্বলছিলো।

অমাবস্যা রাত।

চারদিকে জমাট অন্ধকার থমথম করছে।

দস্যুরাণী আর চন্দনা গাড়িতে উঠে বসলো।

ড্রাইভার গাড়িতে ষ্টার্ট দিতেই জ্বলে উঠলো সার্চলাইটের তীব্র আলো। এবার গাড়ি চলতে শুরু করলো।

দস্যুরাণীর কানে মুখ নিয়ে বললো চন্দনা–দেখলে রাণী, সুচতুর বনহুর কিভাবে আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে কাজ সমাধা করে চলে গেলো, আর আমরা বেকুফ বনে ফিরে যাচ্ছি।

দস্যুরাণী ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললো–চুপ কর চন্দনা, তোকে আর বেশি বাড়িয়ে বলতে হবে না।

চন্দনা অভিমানভরা কণ্ঠে বললো–কি এমন বাড়িয়ে বললাম বলো? দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করবো বলে এলাম অথচ তার টিকিটি পর্যন্ত দেখতে পেলাম না।

দস্যুরাণী আর চন্দনায় যখন কথা হচ্ছিলো তখন গাড়িখানা হীরামন ছেড়ে বেশ দূরে চলে এসেছে। এখন নির্জন পথ আর দু'পাশে পুরান দালানকোঠা, ছোট ছোট দোকানপাট।

গাড়িখানা হঠাৎ একটা নির্জন জায়গায় এসে থেমে পড়লো।

একসঙ্গে দস্যুরাণী এবং চন্দনা চমকে উঠলো।

বলল দস্যুরাণী–কি হলো?

ড্রাইভার বললো–গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে; আর চলবে না।

বল কি! ভীত কণ্ঠে বললো চন্দনা।

দস্যুরাণী বললো–হঠাৎ কি হলো গাড়ির

রাণীজী, গাড়ি বিগড়ে গেছে।

কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলো দস্যুরাণী, সে দস্যু বনহুরের কণ্ঠের সঙ্গে পরিচিত ছিলো, বললো–তুমি!

হাঁ রাণীজী! গাড়িতে ঠেস দিয়ে প্যান্টের পকেটে হাত প্রবেশ করিয়ে সিগারেট কেসটা বের করে নিলো, তারপর একটা সিগারেট বের করে আগুন ধরালো সিগারেটে।

দস্যুরাণী আর চন্দনা একবার অন্ধকারেই মুখ চাওয়া চাওয়ি করে নিলো। ফিসফিস করে বললো চন্দনা–দেখলে রাণী, যা ভাবা যায়নি তাই হলো।

দস্যুরাণী তার হাতখানা প্যান্টের পকেটে রিভলভারের বাটে রেখে সোজা হয়ে বসেছে। প্রস্তুত হয়ে নিয়েছে সে কোনো এক ভয়ঙ্কর অবস্থার জন্য।

একি, দস্যু বনহুর নিশ্চিন্ত মনে সিগারেট পান করে চলেছে।

চন্দনা বললো–তুমি এমন শয়তানি করতে গেলে কেন?

আপনারা কোন কারণে এখানে মানে হীরামনে এসেছিলেন। সেই কারণে আমিও এসেছিলাম তবে প্রধান উদ্দেশ্য আমার ভক্তদের সাক্ষাৎলাভ করা।

গাড়ি ছাড়বে না আমার রিভলভারের সদ্ব্যবহার করবো? কথাটা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললো দস্যুরাণী।

বনহুর একমুখ ধোয়া ছেড়ে বললো–কেন, আমাকে বন্দী করবে না রাণী?

পুরুষের পোশাকে নিখুঁত ছদ্মবেশে, তবু তারা ধরা পড়ে গেলো, এটা বড় দুঃখ এবং লজ্জার কথা।

দস্যু বনহুর বললো–সহচরীকে সঙ্গে নিয়ে নেমে এলো রাণীজী…

দস্যুরাণী রাগে গস গস করছিলো, বললো–সুচতুর তুমি কিন্তু বুদ্ধিমান নও। জানো আমার অনুচরগণ দাঁড়িয়ে আছে চারপাশে।

জানি তারা এ তল্লাটে নেই, আর থাকলেও তারা আমাকে কিছু করতে পারবে না, কারণ যেখানে তারা অবস্থান করছে সে জায়গা আমার আয়ত্তে। হাঁ, এবার নামতে হবে তোমাদের….

না, আমরা নামবো না।

নামতে হবে, কারণ গাড়িখানা বিকল হয়ে গেছে। এ রাতে গাড়ি চলবে না।

বনহুরের কথায় চমকে উঠলো দস্যুরাণী এবং চন্দনা। সম্মুখে একটা ভয়াবহ অবস্থার কথা চিন্তা করে বিচলিত হলো তারা। অবশ্য দস্যুরাণী ভয় পাবার মেয়ে নয়, সে এমন অনেক বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। আজ অবশ্য বিপদটা কিছু গুরুত্বপূর্ণ, কারণ, একে তো অমাবস্যা রাতের অন্ধকার, তারপর স্বয়ং দস্যু বনহুর তাদের সম্মুখে দন্ডায়মান। দস্যুরাণীর দক্ষিণ হাতখানা রিভলভারের বাটে আছে, প্রস্তুত হয়ে আছে সে।

বনহুর বললো–গাড়িতে বসে থাকা উচিত হবে না রাণীজী, নেমে এসো এবং সম্মুখে যে গাড়িখানা দেখছে ওটা জনহীন পোড়াবাড়ি, কাজেই…..

দস্যুরাণীর চোখ দুটো ধক করে জ্বলে উঠলো, রাগত কণ্ঠে বললো–বনহুর, মনে করোনা আমরা দুর্বল। এই মুহূর্তে তোমাকে সায়েস্তা করতে পারি।

তা জানি রাণীজী, তোমার পকেটে রিভলভার রয়েছে এবং তাতে রয়েছে গুলী, তুমি ইচ্ছামত তা ব্যবহার করতে পারে তা তুমি পারবে না।

বনহুর, বেশি কথা বলো না। আমরা ভয় পাবো না, এ কথাও মনে রেখো।

জানি কিন্তু তোমরা অসহায়। এসস, নেমে এসে বলছি……গাড়ির দরজা খুলে ধরে বনহুর।

দস্যুরাণী আর চন্দনা অগত্যা নেমে দাঁড়াতে বাধ্য হলো।

বনহুর বললো–লক্ষী মেয়ের মত আমাকে অনুসরণ করো। এসো, এসো বলছি……বনহুর পোড়োবাড়িখানার দিকে পা বাড়ালো।

দস্যুরাণী ঠিক ঐ মুহূর্তে রিভলভার বের করে বনহুরকে লক্ষ্য করে গুলী ছুড়লো।

বনহুর অন্ধকারে চলতে গিয়ে সোজা না চলে একটু পথে ছেড়ে এগুচ্ছিলো, জানে সে দস্যুরাণীর হাতে রিভলভার আছে। তাই দস্যুরাণীর রিভলভারের গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো।

বনহুর ফিরে দাঁড়িয়ে টর্চের আলো ফেললে দস্যুরাণীর মুখে। বনহুরের শরীরে ড্রাইভারের পোশাক ছিলো কিন্তু তার কাছে তার প্রয়োজনীয় অস্ত্র এবং টর্চ ছিলো।

বনহুর টর্চের আলো দস্যুরাণীর মুখে ফেলতেই দৃস্যরাণী কঠিন কণ্ঠে বললো–এই দন্ডে তোমার মৃতদেহ মাটিতে গড়াগড়ি যেতো…

আমি জানি তুমি পারবে না আমাকে হত্যা করতে। কথাটা বলে একটু হাসলো বনহুর।

যদিও অন্ধকার তবু দস্যুরাণী দেখলো বনহুরের মুখমন্ডল স্বাভাবিক রয়েছে, এতটুকু পরিবর্তন হয় নি।

চন্দনা বললো–রাণী, একবারের জন্য বনহুরের কথাটা রাখো, নইলে বিপদ ঘটবে, বিশেষ করে এই মুহূর্তে।

কথাগুলো চন্দনা দস্যুরাণীর কানে মুখ নিয়ে চাপাকণ্ঠে বললো, তাই বনহুর শুনতে পেলো না।

বনহুর টর্চের আলো ফেলে লক্ষ্য করছিলো চন্দনা আর দস্যুরাণীর শরীরের পুরুষের পোশাক তখনও রয়েছে। কেউ তাদের নারী বলে বুঝতে পারবে না। দস্যুরাণীর হাতে রিভলভার।

বললো বনহুর–তোমরা আমাকে শত্রু বলে মনে করলেও আমি তোমাদের শত্রু নই, যেমন তোমাকেও আমি শত্রু বলে মনে করি না। এসো আমার সঙ্গে, এই পোড়োবাড়িতে প্রবেশ করি, কারণ রাতের জন্য এই বাড়িখানাই হলো আমাদের জন্য নিরাপদ স্থান।

দস্যুরাণী আর চন্দনা অগ্রসর না হয়ে পারলো না।

দস্যুরাণীর দক্ষিণ হাতে গুলীভ রিভলভার। সে সব সময় প্রস্তুত আছে দস্যু বনহুর যদি তাকে কাবু করতে চায় বা সুযোগ নেয় তাহলে সে তাকে ভীষণভাবে আক্রমণ করবে।

চন্দনার মুখখানা ভয়ে বিবর্ণ হলেও কিছুটা যে ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে তা ঠিক তবে রাতের অন্ধকারে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না।

বনহুরকে অনুসরণ করে পোড়াবাড়িখানার প্রায় কাছাকাছি এসে পড়ে তারা।

বনহুর বলে রাণীজী, যে উদ্দেশ্য নিয়ে হীরাময় কলোনীতে এসেছিলেন তা অবশ্য পূর্ণ হলো, এ কথা তুমি অস্বীকার করতে পারো না। আমিও চেয়েছি তোমাদের বাসনা যেন অপূর্ণ না থাকে। কি, সত্যি বলিনি?

আমরা কি উদ্দেশ্য নিয়ে হীরাময় কলোনীতে এসেছিলাম তা তুমি কি করে জানলে বনহুর, বলো?

জানি রাণীজী, আর জানি বলেই তো এত সময় নষ্ট করে এসেছি। তোমাদের উদ্দেশ্য ছিলো দুটো, হোটেলের বয়কে বলেছিলে আমাকে শুধু দেখবে বা দর্শনলাভ করবে আর তোমাদের মনের বাসনা ছিলো আমাকে গ্রেপ্তার করতে। হাঁ, দুটো আশাই তোমাদের পূর্ণ করবো। তোমার একটা আশা পূর্ণ হয়েছে, অপরটা আমাকে গ্রেপ্তার করা, তাই না?

হাঁ, তোমাকে আমি আটক করবোই করবো।

উদ্দেশ্য?

তুমি যা চাও তা কোনোদিন পাবে না।

রাণীজী, তুমিই সেদিন আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলে রক্তে আঁকা ম্যাপখানা আমার হাতে তুলে দেবে এবং এ কারণে আমি সন্ধি স্থাপন করেছিলাম তোমার সঙ্গে কিন্তু তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করে বরং....

হাঁ বনহুর, তাই। রক্তে আঁকা ম্যাপ পেতে আমাকে দারুণ সগ্রাম করতে হয়েছে......একটু থেমে বললো সে–এত সহজে সেই রক্তে আঁকা ম্যাপ আমি তোমার হাতে অর্পণ করবো ভাবতে পারলে?

তাহলে এটাই তোমার শেষ কথা?

হাঁ, রক্তে আঁকা ম্যাপ তুমি পাবে না......

কিন্তু রক্তে আঁকা ম্যাপ আমার চাই রাণীজী। তবে মনে রেখো, আজ আমি তোমাদের কাছে কিছু চাই না, কারণ তোমরা নারী জাতি, দুর্বল তোমরা–দুর্বলের উপর আমি কোনোদিন অত্যাচার করি না।

দস্যুরাণী অন্ধকারেই কট মট করে তাকালো বনহুরের দিকে। চন্দনার মুখমন্ডল নিষ্প্রভ মলিন বনহুরের কথায় কিছুটা আশ্বাস পেলো সে মনে।

বনহুর বললো–বাকি কথা হবে নিরিবিলি! এসো বাড়িটার ভিতরে যাই। এসো......

বনহুর টর্চের আলো ফেলে এগুতে লাগলো পোড়োবাড়িটার মধ্যে।

দস্যুরাণী আর চন্দনা যন্ত্রচালিত পুতুলের মত বনহুরকে অনুসরণ করে পোড়োবাড়িটার মধ্যে প্রবেশ করলো। না করেই বা উপায় কি। দস্যুরাণী মনে মনে নিজকে ধিক্কার দিচ্ছিলো কেন সে হীরামন কলোনীতে এসেছিলো। না এলেই ভাল ছিলো। তারা এখানে আসবে কি করে বনহুর তা জানতে পারলো? তবে কি ঐ বয় ছেলেটার কাছেই বনহুর সবকিছু জেনে নিয়ে সে ড্রাইভারের ছদ্মবেশে এসেছিলো তাকে জব্দ করতে......।

নানা কিছু চিন্তা করতে করতে দস্যুরাণী বনহুরকে অনুসরণ করছিলো, তার পিছনে চন্দনা। দস্যুরাণীর হাতে রিভলভার। বনহুর কিছুটা অগ্রসর হতেই সম্মুখে একটা দেয়াল দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। টর্চের আলো ফেললো সে সম্মুখে, সঙ্গে সঙ্গে শুধু চমকেই উঠলো না তারা, একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়লো।

দস্যু বনহুরের টর্চের আলো স্থির হয়ে গেছে, একচুলও নড়ছে না।

দস্যুরাণীর চক্ষু ছানাবড়া হয়ে উঠে।

চন্দনা আর্তচিৎকার করে দস্যুরাণীর কাঁধে মুখ লুকায়।

তারা দেখতে পায় দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে একটা লোক কিছু কামড়ে কামড়ে খাচ্ছে। লোকটার হাতের কনুই বেয়ে তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। সে কি ভয়ংকর নৃশংস দৃশ্য!

লোকটার সম্মুখে পড়ে আছে একটা মৃতদেহ। বুকখানা তার খন্ডবিখন্ড। বুক চিরে বের করে নেওয়া হয়েছে কলিজা আর হৃৎপিন্ড। লাল টকটকে রক্তের ধারা বয়ে যাচ্ছে।

বনহুর বলে উঠলো–রাণীজী, এই সেই হত্যাকারী যাকে পুলিশ বাহিনী সন্ধান করে ফিরছে। এই সেই নর–মাংস ভক্ষণকারী নররাক্ষস…

দস্যুরাণী ভুলে গেলো এ মুহূর্তে সব প্রতিহিংসা, সে বলে উঠলো–একে আমি চিনি…..

কথা শেষ হয় না, নিমিশে বিদ্যুৎ গতিতে প্রাচীর টপকে ওপাশে চলে যায় সেই নররাক্ষস।

মুহূর্তে বনহুর প্যান্টের পকেট থেকে পিস্তল বের করে গুলী ছুড়লো, কিন্তু ততক্ষণে প্রাচীরের ওপাশে উধাও হয়ে গেছে সে।

দস্যুরাণী আর চন্দনা থ’ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

বনহুর ফিরে তাকালো দস্যুরাণী আর চন্দনার দিকে।

তাদের সম্মুখে পড়ে আছে রক্তাক্ত মৃতদেহটা।